Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

তৃতীয় বর্ষ▪সংখ্যা ১-২ - জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৩

সম্পাদকীয়

বর্তমান প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির করণীয় কী?

ভারতের শততম বিজ্ঞান কংগ্রেস

সাইবেরিয়ায় উল্কাপাত

সাক্ষাৎকার

ডাক্তার ডি. এন. গুহ মজুমদার

ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রী শিবব্রত বসু রায়

গল্প

আলেয়ার আলো

বিজ্ঞানের খবর◆রিপোর্ট

সংগঠন সংবাদ◆চিঠিপত্র

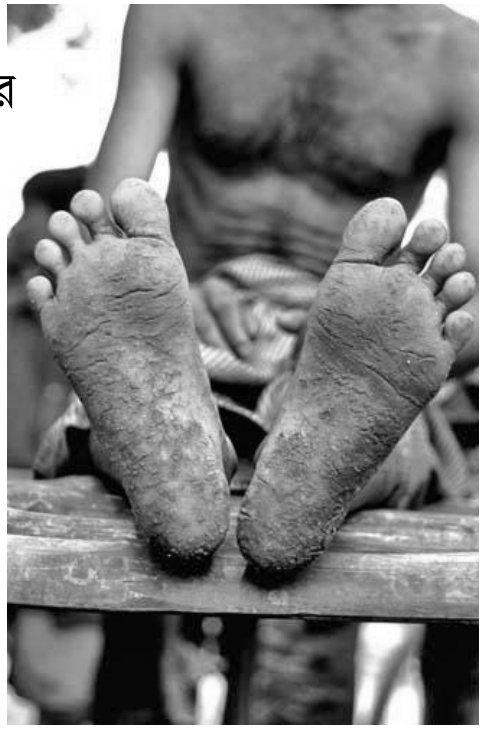

বিশেষ নিবন্ধ

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা ও তার সমাধান

তৃতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ১-২❖জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৩

সম্পাদকীয়

বর্তমান প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির করণীয় কী?

বর্তমান সামাজিক উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সমাজ পরিচালকরা এর সূচনাকাল থেকেই করে আসছেন। উৎপাদন বিকাশের নিজস্ব তাগিদেই এই মালিকেরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন। স্কুল-কলেজ খুলে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমিতি গঠন করা ইত্যাদি কাজ ছিল উল্লেখযোগ্য। এর ফলে বিজ্ঞানের হাত ধরে সামাজিক উৎপাদনে এসেছিল এক অভূতপূর্ব জোয়ার। সেই জোয়ারে (প্রথমে মূলতঃ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়) মানুষের চেতনায় ঘটে যায় এক বিরাট পরিবর্তন। সমাজ ও বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে অতিদ্রুত। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি তার চরম শিখরে পৌঁছে যায়, পাশাপাশি পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে অনেক অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় এই বিজ্ঞানেরই দৌলতে। বিগত তিনশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তা তার পূর্বের দশ হাজার বছরেও হয়নি। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে কোটি কোটি মেহনতী মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রমের ফলে। এই সাফল্য যেহেতু সমগ্র মানবজাতির তাই বিজ্ঞানের সুফলগুলি ভোগ করার নৈতিক অধিকার রয়েছে সমগ্র মানবজাতির। বিজ্ঞানের এই গগণচুম্বী উন্নতির পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক।

ভারতসহ বিশ্বের সমস্ত দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ যাঁরা এই আধুনিক বিশ্বের রূপকার, তাঁরা আজও আধপেটা খেয়ে, বাসস্থানহীন অবস্থায়, দূষণমুক্ত পানীয় জলের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে, শিক্ষার অভাবে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে বসবাস করছেন। একদিকে কোটি কোটি অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষ আর অন্যদিকে গুদামে আর ক্ষেতে বিক্রির অভাবে পচছে কোটি কোটি টন খাদ্যশস্য। মালিকের গুদামে জামা, জুতো, ওষুধপত্র সহ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পাহাড় জমে আছে, আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নাই বলে আছে শুধু অভাব আর অভাব। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থাই হল এই সংকটের উৎস। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত বিকশিত হচ্ছে উৎপাদন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অবিক্রিত মালও ততই বাড়ছে। ফলে ব্যবস্থার সংকট বাড়ছে, কর্মহীনতা বাড়ছে। সংকট চক্রাকারে বড় হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সংকট যতই বাড়ছে ততই মানুষের অভাব বাড়ছে এবং এর থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে সে ভাগ্য, অলৌকিকত্ববাদ, ধর্মবাদ, ঈশ্বরবাদের মায়াজালে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে বাড়ছে ভাগ্য ও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের প্রবণতা, বাড়ছে তাবিজ, কবচ, মাদুলি, ঝাড়ফুঁক আর ভন্ডবাবাদের দাপট।

সমাজ পরিচালকরা কিন্তু এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। অভাবী মানুষ যাতে এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে তাই তাদের পোষা বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সুচতুর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে যাঁরা সবচেয়ে বেশী চর্চা করেন, সমাজে যাঁরা গণ্যমান্য হিসাবে পরিচিত সেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার - শিক্ষক - বিজ্ঞানী - সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ অলৌকিকত্ব, ধর্মবাদ, ঈশ্বরবাদ এবং ভাগ্যের উপর ভরসা করার প্রচার চালাচ্ছেন সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালের মধ্যেই মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। দেশের সরকার বলছে তারা ধর্মনিরপেক্ষ। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্ম থেকে পৃথক ও নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকা, অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সকল ধর্মের প্রচার ও প্রসারে রাষ্ট্রের উদ্যোগই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্মের পরিচয়ের ভিত্তিতেই মানুষকে পৃথকভাবে দেখানো হচ্ছে। প্রতিটি ধর্মই যেহেতু তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তাই ধর্মের প্রসার সাম্যের বদলে সামাজিক অসাম্য বাড়িয়ে তুলছে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে সুনিপুনভাবে ধর্মবাদ, ঈশ্বরবাদ সহ বহু অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে শিশুদের মস্তিষ্কে

ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র কেউ এর ব্যতিক্রম নয়।

এমতাবস্থায় বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের কাছে সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন। কিন্তু এদের অধিকাংশই এখনও প্রধানতঃ ধর্মীয় জারিজুরি ও অলৌকিক রহস্যের পেছনের কারসাজি দর্শকদের মধ্যে তুলে ধরাকেই প্রধান কাজ হিসাবে দেখে। ধর্মবাদ ও অলৌকিকত্বের বিরোধিতা করে কিন্তু সমাজে তা কেন টিঁকে আছে অর্থাৎ উৎসের বা কারণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, ফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বিষবৃক্ষকে মূল হতে উপড়ে না ফেলে তার ডালপালা ছেঁটে সমস্যা দূর করার প্রবণতাই প্রধানভাবে লক্ষ্যণীয়। বর্তমান সমাজ ও তার অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্র যে শ্রেণী আধিপত্যের ভিত্তিতে টিঁকে আছে এটা না বুঝে যদি রাষ্ট্রকে তার ঘোষিত নীতি হিসাবে 'শ্রেণীনিরপেক্ষ" বিবেচনা করা হয় তবে সমস্যার উৎসে পৌঁছানো যায় না। অধিবিদ্যক ধারণা অনুসারে প্রতিটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে সমস্যার মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বদলে যুক্তিবাদকে গ্রহণ করলে সমস্যার কারণ ও সমাধানের রাস্তা পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি, পরিবেশ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, জ্বালানী সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক ও দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে যাচাই না করে সরাসরি শিরোধার্য করা বা সরাসরি বর্জন করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। পরিবেশপ্রেমী, পশুপ্রেমী, উদ্ভিদপ্রেমী সংগঠনগুলির এক বড় অংশ পরিবেশ, পশুপাখি, উদ্ভিদ, প্রকৃতিকে মানবসমাজ বহির্ভূত বিষয় হিসাবে দেখছেন আর সবধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য সাধারণ মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। এঁরা পরিবেশের সাম্যকে স্থিতিশীল সাম্য হিসাবে বিচার করে গতিশীল সাম্য হিসাবে নয়। মানুষের জন্মের বহু পূর্বে এই বিশ্বে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিবর্তনের মাধ্যমে তার বিকাশ যেমন হয়েছে তেমনই প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিতে না পারার জন্য যুগে যুগে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলোপও ঘটেছে। জীবজগতের ন্যায় জড়জগতের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। মেসোজোয়িক যুগে পৃথিবীর স্থলভাগে যে ডাইনোসর বাস্তুতন্ত্রে প্রধান ভূমিকা রাখত, এই যুগের শেষ পর্যায় (আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে) তার বিলোপ ঘটায় পরিবেশ ধ্বংস হয়নি। পুরানো বাস্তুতন্ত্রের জায়গায় নতুন বাস্তুতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। পরিবেশে পুরানোর বদলে নতুন সাম্যের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের প্রতিটি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে অধিবিদ্যক এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ঝোঁকই এই বিচ্যুতির প্রধান কারণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য হল সমাজের প্রতিটি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্যাগুলিকে উৎস হতে নির্মূল করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞান আন্দোলনকে মূল সামাজিক আন্দোলনের অধীনে পরিচালনা করা। ■

বিজ্ঞপ্তি

সমীক্ষণের জানুয়ারী সংখ্যা প্রস্তুতি অত্যধিক বিলম্বিত হবার কারণে জানুযারী ও এপ্রিল সংখ্যা যৌথভাবে প্রকাশিত হল। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।

অনিবার্য কারণে 'শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান' ধারাবাহিক রচনাটি আপাততঃ স্থগিত রাখা হল। এজন্য পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ভারতের শততম বিজ্ঞান কংগ্রেস

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিজ্ঞান নীতি ঘোষণা করলেন

কলকাতার প্রফেসর জে এল সিমনসেন এবং প্রফেসর পি এস ম্যাকমোহন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন (ISCA) গঠন করেন ব্রিটিশ সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের অনুকরণে। ঐ বছরই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি সভাঘরে ১৫-১৭ই জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতে প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম কংগ্রেসে ১০৫ জন বিজ্ঞানী ৩৫টি বৈজ্ঞানিক রচনা পেশ করেন উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূতত্ব এবং এথনোগ্রাফি বিষয়ের উপর। বর্তমানে এই অ্যাসোসিয়েশনে দশ হাজারের বেশী সদস্য আছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৪টি বিভাগ রয়েছে।

এবারের শততম কংগ্রেসে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ১২,০০০ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান নীতি ঘোষণা করেন এবং বলেন এই কংগ্রেসের থিম হল "বিজ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপদান করা" (Science for shaping the future India)। ভারত সরকারের জাতীয় বিজ্ঞান নীতি – 'নতুন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নীতি ২০১৩' ঘোষণা করে বলেন সরকারের লক্ষ্য হল ২০২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থ পাঁচটি বৈজ্ঞানিক শক্তির একটিতে উন্নীত করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। তাই বিজ্ঞানীদের কর্তব্য হল বিজ্ঞানকে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যবহার করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দেশের মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা দিতে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রতিবছর ৪% কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দিতে নজর দেওয়া হবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা হল জল এবং জমি। জল বাঁচানোর প্রযুক্তিতে তাই বিপ্লব আনতে হবে, জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে এবং যে কোন জলবায়ুতেই উৎপাদন সম্ভব এবং বীজ সৃষ্টি করতে হবে। কৃষির এই রূপান্তরই হবে প্রধান লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যবোধ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হতে হবে বিজ্ঞানের দানকে সমাজে পৌঁছে দিতে। জিনগতভাবে পরিবর্তিত খাদ্য, পারমাণবিক শক্তি, মহাবিশ্বের গবেষণা ইত্যাদি জটিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে আবেগ ও ভয় থেকে বর্জন না করে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন কৃষিতে উন্নতির পাশাপাশি শক্তির সুরক্ষা, স্যানিটেশন, পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, শ্রমনির্ভর উৎপাদনক্ষেত্র এবং সকলের স্বাস্থ্য স্বল্পমূল্যে দেওয়াই হবে সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দ বর্তমানে জিডিপি'র (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ করা দরকার। তিনি এই বিষয়ে প্রাইভেট লগ্নী বাড়াতে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন এবং গবেষণা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন এবং উদ্ভাবনগুলির বাণিজ্যকরণে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন। ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ মারফৎ সক্রিয় ভূমিকা রাখার কথা বলেন। বিদেশে চলে যাওয়া ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসও প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী যুবশক্তির মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টির জন্য স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র ও বাড়িতে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য লগ্নী করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। আর্থিক বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে স্কলারশিপ ও গবেষণাখাতে বরাদ্দকে অগ্রাধিকারের কথা বলেন। সবশেষে উপস্থিত সকলকে 'শুভ নববর্ষ' জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের একজন আধিকারিক সাংবাদিকদের বলেন যে সরকারের ৬টি

বিজ্ঞান বিভাগ – ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটোমিক এনার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস এন্ড মিনিষ্ট্রি অফ সায়েন্স-এর খাতে বর্তমানে জিডিপি'র ০.৩৩% খরচ হয়। জিডিপি'র ০.৩৮% বরাদ্দ হয় কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ এবং কিছু সামাজিক মন্ত্রকের খাতে। বিজ্ঞান ও গবেষণায় বর্তমানে শিল্প সংস্থাগুলির তরফে খরচ হয় জিডিপি'র ০.৩৬ শতাংশ। ২০১৭-এর মধ্যে সরকারের লক্ষ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে মোট জিডিপি'র ০.৭১ শতাংশের বদলে ১ শতাংশ বরাদ্দ করা। বাকি ১% শিল্পপতিদের কাছ থেকে পাওয়ার আশা প্রকাশ করছে সরকার। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে প্রধান বিনিয়োগকারীরা হল টাটা কেমিক্যাল, থার্ম্যাক্স লিমিটেড, ইনটেল কর্পোরেশন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), নোকিয়া গ্রুপ (ফিনল্যান্ড) এবং ম্যাক্সিমা ইন্টিগ্রেটেড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের আধিকারিক এও মন্তব্য করেন যে বর্তমানে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সরকার ও প্রাইভেট সংস্থার বিনিয়োগের হার আছে ৩:১, আগামী ৫ বছরে তা ১:১ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছাড়া বিজ্ঞান কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় মুখ্য আলোচনায় সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রধান বিজ্ঞান উপদেষ্টা জন বেডিংটন বলেন যে ভারতের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। এছাড়া শক্তি উৎপাদন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাকেও সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

ভারতের প্রধান বিজ্ঞান উপদেষ্টা ড: আর চিদাম্বরম অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি চিহ্নিতকরণকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন।

সি এস আই আর-এর ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর এস ব্রহ্মচারী বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্যাবলীর যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষায় নতুন প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

এই শততম বিজ্ঞান কংগ্রেসে যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল ঃ

১) প্রতিভা আবিষ্কারের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুব সমাজকে নেতৃত্বদানে উৎসাহিত করা।

২) বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার করে অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে গবেষণার পুনর্জন্ম প্রদান করা।

৩) সমস্যার সাথে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার সংযোগ স্থাপন করার দায়িত্বগ্রহণ।

৪) আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার নতুন মডেল রচনা করা।

৫) দেশের খাদ্য, পুষ্টি, শক্তি, পরিবেশ, জল এবং স্যানিটেশন ক্ষেত্রে বিকাশের যে প্রতিকূলতা আছে তাকে জয় করার লক্ষ্যে রণনীতি এবং রোড ম্যাপ তৈরী করা।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিজ্ঞানীরা তাঁদের রচনা পেশ করেন গতানুগতিক ধারায়। উপস্থিত বিজ্ঞানী, ছাত্র ও বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে সেগুলি প্রসঙ্গে তেমন কোনও উৎসাহ নজরে আসেনি। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে অনেক স্টল খোলা হয়েছিল কিন্তু দর্শক ছিল নগণ্য। দিল্লী, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, আগ্রা বা হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত বিগত কংগ্রেসগুলিতে ছাত্র ও গবেষকদের যেমন ভিড় লক্ষ্য করা গেছিল, আড়ম্বর বেশী থাকলেও এবারে অংশগ্রহণের মাত্রা তুলনায় অনেক কম। এই নিয়ে কংগ্রেসে বহু বিজ্ঞানীকে হতাশা ব্যক্ত করতে দেখা গেছে।

সরকারের নয়া বিজ্ঞান নীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বাণিজ্যকরণ বৃদ্ধি ছাড়া নতুন কিছুই না মেলায় বহু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেছে। সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিক্যুলার বায়োলজির পক্ষ থেকে অধ্যাপক পুষ্প ভার্গব বলেন "অতীতে আমি নিয়মিত সায়েন্স কংগ্রেসে যেতাম কিন্তু এখন কখনও সখনও যাই। খুব কম বিজ্ঞানীই এখন সায়েন্স কংগ্রেসে আসেন কারণ এখান থেকে তাঁরা কিছুই পান না।" বিজ্ঞানী পুষ্প মোহন ভার্গব বলেন, উদ্ভাবনের সম্পূর্ণ বাণিজ্যকরণ হয়ে গেছে। যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নীতির কথা বলা হয়েছে তা আদতে নেতা মন্ত্রীদের ইচ্ছাপূরণের তালিকা। হোমিওপ্যাথি থেকে জ্যোতিষ চর্চা, সর্বত্র অনর্থক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি করলেই দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। **দেশে কৃষি উৎপাদনে প্রচুর সমস্যা আছে কিন্তু খাদ্যের অভাব নাই। আসল সমস্যা হল – দেশের মানুষের কাছে এই খাবার কেনার টাকা নাই। উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় প্রতি বছর উৎপাদিত ফসলের ৪০% নষ্ট হচ্ছে।**

ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স, চেন্নাই এর অধ্যাপক জি রাজাশেখরণ বলেন, দেশের মেধাবী ছাত্ররা ভাল কাজের সন্ধানে বিদেশে চলে যাচ্ছেন, ফলে দেশের মেগা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলির জন্য মানবশক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ব্ল্যাঙ্ক

চেক হাতে নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

৫ই জানুয়ারি সার্ন-এর অধিকর্তা রলফ ডিটর হ্যায়ের তাঁর ভাষণে বলেন, হিগস বোসন আবিষ্কারে ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন বসু'র অবদান মহান। আমি বোসন শব্দটি কখনও ছোট অক্ষরে লিখি না। বোসনের 'বি' ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখি। তিনি বলেন, **হিগস্ বোসন-কে 'ঈশ্বর কণা' বলা অর্থহীন, ঈশ্বর কণা বলে কিছু নেই।** লেডারম্যানের বই-এর নাম থেকে এই শব্দটি এসেছে কিন্তু এই বইতে এর কোনও উল্লেখ নেই।

একটি পত্রিকাতে শ্রীমতী কুমকুম দাসগুপ্ত লিখেছেন যে বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে এবং জনমানসে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তুলে ধরতে হলে উন্নত দেশগুলি যেমন ইংলন্ড, ফ্রান্স, জাপানের মত মহল্লায় মহল্লায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও ভিডিও প্রদর্শন দরকার। ওদেশের বিজ্ঞান সংগঠনগুলি এটা করে থাকে। আমাদের দেশে বাস্তবিকই তার প্রচলন নেই। বিজ্ঞান সংগঠনগুলি এদেশে এখনও প্রধানতঃ ধর্মীয় জারিজুরি ও অলৌকিক রহস্যের পেছনের কারসাজিই দর্শকদের মধ্যে তুলে ধরে।

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র মন্তব্য করেছেন সায়েন্স কংগ্রেস দেশে বিজ্ঞান প্রসারের জন্য হয় না, এটা কিছু বিজ্ঞানীর গ্ল্যামার প্রদর্শনের জায়গা। ওখানে যা চর্চা হয় তা কলেজ ছাত্রদেরও বোধগম্য হয় না। যে দেশে মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় প্রচারে অংশ নেন, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেন সেখানে কংগ্রেস করে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে না।

অন্যান্যবারের মত এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেস নিয়ে বিজ্ঞানীদের হতাশা প্রকাশের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জি এম ফুড, পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার ইত্যাদি নীতি ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী এবং এনজিও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ■

সাইবেরিয়ায় উল্কাপাত

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় রাশিয়ার সাইবেরিয়ার চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে ভয়াবহ উল্কাপাতের ঘটনা ঘটেছে। আগুণের গোলার মত উল্কাবৃষ্টিতে সহস্রাধিক মানুষ আহত হন। এর মধ্যে প্রায় ২০০ জন শিশু। যদিও কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। অধিকাংশ বাড়ি, স্কুল, হাসপাতালের ছাদ, জানলার কাঁচ ভেঙে যায়। বর্তমানে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। ফলে এই প্রবল বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। সরকার ত্রাণের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা গেছে। কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের অ্যামেচার ক্যামেরায় তোলা ভিডিও ফুটেজে এই মহাজাগতিক ঘটনা পৃথিবীর বহু মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন।

রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে প্রায় ১০ টন ভর বিশিষ্ট, লোহা ও নিকেল ধাতু মিশ্রিত আয়রন মিটিওরাইট বা উল্কাপিন্ড পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে প্রতি সেকেন্ডে ১৫-২০ কিমি গতিবেগে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার সময় ঐ উল্কাপিন্ডটিকে একটি ল্যাজবিশিষ্ট সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী বলে মনে হয়েছিল। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ কিমি উচ্চতায় ওই উল্কাপিন্ডটি বায়ুমন্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং প্রায় ৩০-৫০ কিমি (ব্যাস) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছোট ছোট টুকরোর আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

অ্যাস্টেরয়েড এবং মিটিওরাইট কী ?

সৌরজগতে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অসংখ্য গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েড দিয়ে অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট বা

গ্রহাণুপুঞ্জ অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের মতে যে সোলার নেবুলা বা উত্তপ্ত গ্যাস থেকে সূর্য এবং তার সৌরমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে, সেই একই পদার্থ থেকেই সৌরমন্ডলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা উপগ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। এই অ্যাস্টেরয়েডগুলিও অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কখনও তা কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেড়িয়ে মহাশূণ্যে বা অন্য গ্রহে (যেমন পৃথিবী) আছড়ে পড়ে। পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে আসা এই অ্যাস্টেরয়েডের টুকরোগুলিকে আমরা মিটিওরাইট বা উল্কা বলি। একই উৎস থেকে সৃষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর রাসায়নিক উপাদানের সাথে এই উল্কাগুলির রাসায়নিক উপাদানের মিল পাওয়া যায়। কতগুলি উল্কার সাথে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের (ক্রাস্ট), কতগুলির সাথে পৃথিবীর গুরুমন্ডলের (ম্যান্টল) আবার কতগুলির সাথে পৃথিবীর কেন্দ্র (কোর)-এর রাসায়নিক ধর্মের মিল আছে। যেমন ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাইবেরিয়ার উপর পতিত আয়রন মিটিওরাইট (প্রধানভাবে আয়রন ও সামান্য নিকেল মিশ্রিত) এর সাথে পৃথিবীর কেন্দ্রের রসায়নের মিল আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগেই জানা ছিল যে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে এক বিশাল আকারের গ্রহাণু (অ্যাস্টেরয়েড) প্রদক্ষিণ করে যাবে। এটা তাঁরা গাণিতিক উপায়ে আগেই নির্ধারণ করেছিলেন। নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে ঐ দিন ভারতীয় সময় রাত ১২ টা ৫৫ মিনিটে ৪৫-৫০ মিটার ব্যাসের ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন ভর বিশিষ্ট একটি অ্যাস্টেরয়েড (জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন অ্যাস্টেরয়েড ২০১২ ডি এ ১৪) পৃথিবী থেকে ১৭২০০ মাইল দূর দিয়ে চলে গেছে। নাসার বিজ্ঞানীদের মতে এই মাপের অ্যাস্টেরয়েড প্রায় ৪০ বছর অন্তর পৃথিবীর খুব কাছ থেকে চলে যায় এবং প্রায় ১২০০ বছর অন্তর পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ে। নাসাসহ বিশ্বের অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করছেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাইবেরিয়ার উল্কাপাত আর ওই দিনই পৃথিবী থেকে মাত্র ২৭০০০ কিমি দূর দিয়ে যাওয়া অ্যাস্টেরয়েড '২০১২ ডি এ ১৪'-র সম্পর্ক আছে। ওই অ্যাস্টেরয়েডের ছোট কোন টুকরো (প্রায় ১০ টন) সেদিন সাইবেরিয়ায় আছড়ে পড়েছিল। এই সব অ্যাস্টেরয়েডগুলি বিভিন্ন সময় পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা আবার ঘটবে। তাই এই উল্কাপাত কোনও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা নয় প্রাকৃতিক ঘটনা। কোন দেবতার রোষে এমন হয় না, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা ঘটে থাকে। যেহেতু পৃথিবীর তিনভাগ জল (আগে আরও বেশি ছিল) এবং একভাগ স্থল তাই

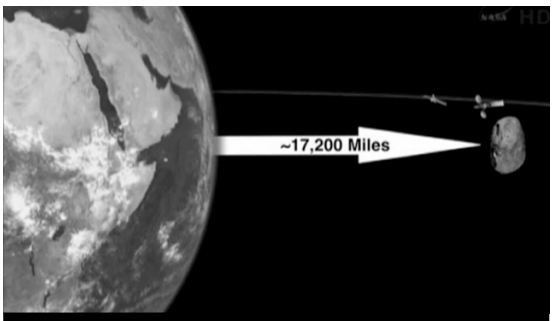

পৃথিবী থেকে ১৭,২০০ মাইল দূর দিয়ে চলে যাওয়া অ্যাস্টেরয়েড

অধিকাংশ সময়ই এগুলি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং মহাদেশের প্রাণীজগৎ এর আঘাত থেকে রক্ষা পায়। কোন তাবিজ কবজ পরে, দেবদেবী বা ঈশ্বরের আরাধনা করে এর আঘাত থেকে বাঁচা যায় না।

ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রোপালম ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা তথ্য ঘেঁটে জানিয়েছেন যে আজ থেকে প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাষ্ট্রে এইরকমই একটি মিটিওরাইট বা উল্কার আঘাতে পৃথিবী পৃষ্ঠ ধুলোয় রূপান্তরিত হয়ে ১৭০ মিটার গভীর এবং প্রায় ১২০০ মিটার ব্যাসের একটি গর্ত তৈরী হয়েছিল। ১৯০৮ সালে রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের বনভূমিতে একটি উল্কাপাত হয়, যার প্রভাবে সেখানকার প্রায় ২ হাজার বর্গ কিমি বিস্তৃত বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে অর্থাৎ ক্রিটেশিয়াস যুগের শেষের দিকে প্রায় ৬ মাইল বা ৯.৬ কিমি ব্যাসযুক্ত এক প্রকান্ড অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ে এবং এর ফলে ২৪ লক্ষ টি এন টি (ট্রাই নাইট্রো টলুইন) শক্তি নির্গত হয় যার ক্ষমতা হিরোসিমার পরমাণু বিস্ফোরণের কয়েকশত গুণ। সেই সময় পৃথিবীতে ডাইনোসর সহ অসংখ্য সরীসৃপ ও মেরুদন্ডী প্রাণী, অমেরুদন্ডী প্রাণী, নানা গাছপালা ছিল। মহাদেশে ডাইনোসর সহ নানা মেরুদন্ডী প্রাণী ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই চিরবিদায় নেয়। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল সেফালোপোডা বর্গের অ্যামোনাইট। ডাইনোসর এর মত তারও চিরবিলোপ ঘটে। বিস্ফোরণটি ঘটে তৎকালীন মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে। তখন হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হয়নি এবং ভারত – অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আনটার্কটিকা, ম্যাডাগাস্কার সংলগ্ন এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত ছিল। ■

বিশেষ নিবন্ধ

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা ও তার সমাধান

জল ছাড়া মানুষ কেন কোনও জীবজন্তুর পক্ষেই বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। জলের তাই অপর নাম জীবন। কিন্তু পানীয় জল থেকেই যেহেতু মানুষের শরীরে নানা অসুখ-বিসুখ হয়, তাই তা নিয়ে রয়েছে নানা আতঙ্ক। আমরা পানীয় জল পেয়ে থাকি পুকুর-নদী-নালা-হ্রদ-ঝর্ণা এবং নলকূপের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে। বর্তমানে সমুদ্রের নোনা জল পরিশুদ্ধ করেও তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পানীয় জল একদিকে যেমন আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, খাদ্য পরিপাক করে, দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে, রক্তের অম্ল-ক্ষারের মাত্রা বজায় রাখে বলে আমরা সুস্থ থাকি তেমনই পানীয় জলে দ্রবীভূত ও ভাসমান নানা জীবাণু-কলেরা, ডাইরিয়া, জন্ডিসের মত অসুখ ছড়ায়। পানীয় জলে শুধু জীবাণুই থাকে না, থাকে দ্রবীভূত ও ভাসমান নানা জৈব ও অজৈব রাসায়নিক। যেমন আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ক্যাডমিয়াম, ফ্লুয়োরাইড ইত্যাদির অজৈব রাসায়নিক যৌগ এবং বেঞ্জিন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ডাইক্লোরোমিথেন ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক যৌগ নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত হলে শরীরে নানা অসুখ সৃষ্টি হয় এবং এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এই কারণে জীবাণুর পাশাপাশি ক্ষতিকারক রাসায়নিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবী সামাজিক দাবী হিসাবে উঠে আসছে।

অজৈব রাসায়নিকগুলির মধ্যে আর্সেনিক যুক্ত যৌগগুলি ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলে এবং তা দীর্ঘদিন পান করলে মানুষের শরীরের কিডনি, লিভার, ফুসফুস, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং চামড়ায় সঞ্চিত হয়ে নানা অসুখের এবং এভাবে দীর্ঘদিন চললে ক্যানসারের মত অসুখও সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে জীবনশক্তি হারিয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এই জন্য আর্সেনিককে এক ধরনের 'সেঁকো বিষ' বলা হয় এবং তা পানীয় জলে অতিরিক্ত থাকলে গভীর চিন্তার বিষয় হয়।

বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের মানুষ আজ আর্সেনিকের স্বীকার। প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং ভারত তার শীর্ষস্থানে আছে। নেপাল, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, পেরু, চিলি, ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশগুলিতে এর প্রভাবে কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত।

ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা নদী উপত্যকায়, অসমের ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদী উপত্যকায়, মণিপুরের ইম্ফল নদী উপত্যকায় ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও গ্রামের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমৃদ্ধ যৌগ মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। পঞ্জাব-হরিয়ানার চন্ডীগড় অঞ্চল এবং অন্ধ্র প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও এর রিপোর্ট আছে। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র (বাংলাদেশের পদ্মা-যমুনা) নদী উপত্যকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চল হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে চিহ্নিত। এই অঞ্চলের প্রায় ৩৬ কোটি মানুষ বসবাস করেন এবং তার মধ্যে ৫ কোটি মানুষ যে জল পান করেন তা বিশ্ব সংস্থা, ভারত-বাংলাদেশের সরকার এবং বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে গবেষণারত মানুষদের মতে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই আর্সেনিক কী? এর উৎস কী? পানীয় জলে বিশেষতঃ ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে এর পরিমাণ বেশী হয় কেন? মানব শরীরে এর ক্ষতিকর প্রভাব কী? আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা কী? পানীয় জলকে আর্সেনিকমুক্ত করণের পদ্ধতি কী? বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিজ্ঞানসম্মত উপায় কী? তা জানা বোঝা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন দেশের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এক্ষেত্রে ভূমিকা কী? এই রচনায় এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আর্সেনিক কী?

আর্সেনিক একটি মৌল (As), যার পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) ৩৩। এটি একটি ধাতুকল্প (metalloid) যা ধাতু এবং অধাতু দুটিরই বৈশিষ্ট সম্পন্ন। এর ইলেকট্রন বিন্যাস $1S^2\ 2S^2\ 2p^6\ 3S^2\ 3p^6\ 4S^2\ 3d^{10}\ 4p^3$। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ আর্সেনিক কঠিন হিসাবেই পাওয়া যায় এবং এর যোজ্যতা –৩, +৩, +৫। আর্সেনিক বিশুদ্ধ মৌল (As) হিসাবেও প্রকৃতিতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় আবার আর্সেনাইড (–৩ যোজ্যতা সম্পন্ন), আর্সেনাইট (+৩ যোজ্যতা সম্পন্ন) এবং আর্সেনেট (+৫ যোজ্যতা সম্পন্ন) যৌগ হিসাবেও পাওয়া যায়। আর্সেনাইট এবং আর্সেনেট মানব শরীরের প্রধানভাবে

ক্ষতি করে থাকে। আর্সেনিক সমৃদ্ধ জৈব যৌগের চেয়ে অজৈব যৌগগুলির ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। কৃত্রিমভাবে তৈরী আর্সেনিক যৌগ হল প্যারীস গ্রীণ (কপার অ্যাসিটো আর্সেনাইট), ক্যালসিয়াম আর্সেনেট এবং লেড হাইড্রোজেন আর্সেনাইট। এগুলি পোকা মারার বিষ বা সাধারণ বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্সেনিকের ব্যবহার

আর্সেনিক শব্দটি গ্রীক শব্দ আর্সেনিকস (পুরুষালি) এবং ল্যাটিন শব্দ আর্সেনিকাস থেকে ইংরাজীতে এসেছে। ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ আর্সেনিক অ্যালয় তৈরী করে ব্যবহার করত তাকে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বিজ্ঞানী অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস সাবানের সাথে আর্সেনিক ট্রাই সালফাইট পুড়িয়ে প্রথম আর্সেনিক মৌল পৃথক করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ান যুগে সম্ভ্রান্ত মহিলারা ফর্সা হওয়ার জন্য আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড, চক এবং ভিনিগারের সাথে মিশিয়ে খেতেন। প্রাচীন যুগ থেকে আর্সেনিককে মানুষ বিষ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। আর্সেনিককে "King of Poinsons & Poison of King" বা "বিষের রাজা এবং রাজাদের বিষ" বলা হত কারণ প্রাচীন কাল থেকেই রাজারা শত্রুপক্ষকে কাবু করতে, প্রাণে মারতে এই বিষ প্রয়োগ করে এসেছে। আধুনিক যুগেও যুদ্ধে আর্সেনিকের ব্যবহার হয়। পারদের তৈরী মিশ্র ধাতু দিয়ে গড়া লেড বুলেটে ২% আর্সেনিক মেশানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট আর্সেনিক যৌগ লেউইসাইট (lewisite) ব্যবহার করেছিল। ১৯৫০ সালে ওই দেশে ২০,০০০ টন লেউইসাইট-এর মজুত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক চাপে আমেরিকা সেগুলি প্রশমন করে মেক্সিকো উপসাগরে ফেলেছে বলে দাবী করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকা এজেন্ট ব্লু নামে একটি রাসায়নিক সোডিয়াম ক্যাকোডাইমেট নামক অ্যাসিড তৈরী করে ভিয়েতনামীদের উপর প্রয়োগ করে। এতে প্রচুর ভিয়েতনামী সৈনিক এবং সাধারণ মানুষ নিহত হন এবং মাঠের সব ফসল বিষাক্ত হয়ে যায়।

আর্সেনিক মানুষের শুধু অপকার করে না, উপকারও করে। গাছের পোকা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক মারতে, কাঠকে পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে মানুষ আর্সেনিক যৌগ বহুদিন ধরেই ব্যবহার করে আসছে। লেড হাইড্রোজেন আর্সেনেট ব্যবহার করা হয় সাধারণভাবে পোকা মারার বিষ হিসাবে। গত শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যায় থেকে মোনোসোডিয়াম মিথাইল আর্সেনেট (MSMA) এবং ডাইসোডিয়াম মিথাইল আর্সেনেট (DSMA) পোকা মারার বিষ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ এগুলি লেড আর্সেনেটের তুলনায় কম বিষাক্ত।

প্রাণীদেহে বিশেষতঃ পোল্ট্রীফার্মগুলিতে রোগ প্রতিরোধক ও বৃদ্ধির জন্য আর্সেনিক যৌগ ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান উপাদান হল রোক্সার্সন (roxarsone)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ব্রয়লার মুরগীর শরীরে এই রোক্সার্সন ব্যবহার করে ৯০% বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৯ সালে Poison free Poultry Act 2009 অনুসারে রোক্সার্সন ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছে উন্নত দেশে। আমাদের দেশ সহ অনেক দেশে যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হচ্ছে গোপনে। ফাইজার ইন্‌ক নামক একটি বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানী এবং তার দুহিতা কোম্পানী অ্যালফার্মা এই রোক্সার্সন প্রস্তুত করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

ওষুধ শিল্পেও আর্সেনিকের অনেক ব্যবহার আছে। আর্সফেনাসাইন নামক আর্সেনিক যৌগ নিওম্যালভার্সান সিফিলিস এবং টাইপ্যানোমিয়াসিস রোগে বহুকাল ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্বে। বিগত ৫০০ বছর ধরে ক্যানসারের চিকিৎসায় আর্সেনিক যৌগের ব্যবহার হয়ে আসছে। আমেরিকার ফুড এবং ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ২০০০ সালে আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইডকে ক্যানসার রোগের প্রতিষেধক কেমোথেরাপি হিসাবে ব্যবহারে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড কোষের এ টি পি গঠনে বাধা সৃষ্টি করে ক্যানসার সহ অন্য কোষের কোষ বিভাজনে বাধা সৃষ্টি করে। শরীরের ভিতরে থাকা টিউমার চিহ্নিত করতে আর্সেনিক ৭৪ (As^{74}) ব্যবহার করা হয় সাফল্যের সাথে।

ধাতু শিল্পে বিশেষতঃ অ্যালয় প্রস্তুতিতে আর্সেনিকের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ির ব্যাটারিতে প্রয়োজনীয় পারদকে শক্তি প্রদান করতে তাতে সামান্য আর্সেনিক যুক্ত করা হয়। কপার জিঙ্ক অ্যালয় থেকে জিংক ধাতু পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে আর্সেনিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর, যা জটিল ইলেকট্রিকাল সার্কিট তৈরীতে কাজে লাগে। এই সেমিকনডাক্টর সিলিকা সেমিকন্ডাক্টর থেকে বেশী দ্রুত কাজ করে যদিও বেশী ব্যয়বহুল। ২০০৮ সালে গবেষণায়

প্রমাণ হয়েছে কিছু ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ করার সময় আর্সেনাইট থেকে আর্সেনেট প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াটিই ভূপৃষ্ঠের নীচে (অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে) জলে অদ্রবীভূত আর্সেনাইটকে আর্সেনেট দ্রবণ সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা নেয়।

অর্থাৎ আর্সেনিক মানুষের উপকারে এবং অপকারে দুক্ষেত্রেই লাগে। তবে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য, জল, বায়ু-র সাথে মানব শরীরে আর্সেনিক যৌগ সঞ্চিত হলে নানা দুরারোগ্য ব্যাধী সৃষ্টি হয় তাই আর্সেনিকের উৎস এবং মানব শরীরে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত জানা দরকার।

আর্সেনিকের উৎস কী?

প্রকৃতিতে আর্সেনিক মৌলের প্রধান উৎস হল আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ। আর্সেনিক বিশুদ্ধ মৌল (Native element) হিসাবে খুব কমই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থে আর্সেনিক থাকে দুভাবে – MAsS এবং MAs_2 (M = ধাতু যেমন Fe, Ni, Co এবং As = আর্সেনিক) যেমন আর্সেনোপাইরাইট (FeAsS), রিয়েলগার (As_2S_3), অরপিমেন্ট (As_4S_4)। এছাড়া লোহা, তামা, সোনা, পারদ, জিঙ্ক ধাতুর সালফাইড খনিজের সাথে আর্সেনিক স্বল্প পরিমাণে থাকতে পারে। ভূত্বকে যে সব মৌল পাওয়া যায় তার মধ্যে আর্সেনিকের স্থান ২০তম (ভূত্বকে সর্বাধিক পাওয়া যায় অক্সিজেন এবং তারপর সিলিকন)। ভূত্বকের মাটি ও পাথরে গড়ে ০.০০০২-০.০০০৫% আর্সেনিক পাওয়া যায়। কয়লার মধ্যে সালফাইড যৌগের সাথে প্রতি কি.গ্রা'তে গড়ে ১০ মি.গ্রা পর্যন্ত আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন কয়লায় গড়ে ১০০০ মি.গ্রাম প্রতি কেজি পর্যন্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়। অদূষিত এবং অকর্ষিত জমিতে (virgin soil) গড়ে ৪০ মি.গ্রা প্রতি কেজি আর্সেনিক পাওয়া যায়। আবার দূষিত জমিতে তার পরিমাণ ৫০০ মি.গ্রা প্রতি কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

খাদ্যের মধ্যে পাতাযুক্ত সব্জি, চাল, আপেল, আঙুর, সামুদ্রিক মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য, পোল্ট্রিজাত মাংস ইত্যাদির মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রা ভাল থাকে। ইউনাইটেড কিংডম এর কৃষি-মৎস্য ও খাদ্য বিভাগের তথ্য অনুসারে সে দেশের মানুষ গড়ে প্রতিদিন ১ কেজি ৪৬০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে এবং তাতে ০.০০০৮১ মি.গ্রা-এর কম আর্সেনিক থাকে। চীন এবং অন্যান্য দেশের মাঝিরা সামুদ্রিক মাছ বেশী খায় এবং তাদের ৯৩% প্রতিদিন গড়ে ০.০০২১ মি.গ্রা. আর্সেনিক খাদ্যের সাথে গ্রহণ করে। ভারতীয়দের মধ্যে আর্থিক অবস্থা, ভৌগলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাস ভেদে খাদ্যের সাথে আর্সেনিক গ্রহণের মাত্রা বিভিন্ন। উদ্ভিদ ও প্রাণীজ খাদ্যের সাথে মানুষ প্রতিদিন যে আর্সেনিক গ্রহণ করে তা মূলতঃ আর্সেনোবেটেইন, যা কম ক্ষতিকর।

প্রতিদিন একজন মানুষ গড়ে ২০ ঘন মিটার বাতাস গ্রহণ করে পরিবেশ থেকে। এই বাতাস থেকে একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ০.০০০২৪ মি.গ্রা. আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। ধাতু শিল্প, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা কয়লা শিল্পে কর্মরত একজন শ্রমিক সর্বাধিক ০.০০৬ মি.গ্রা. আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। ধূমপানের মাধ্যমেও শরীরে আর্সেনিক অক্সাইড গৃহীত হয়।

একজন মানুষ আর্সেনিক যৌগ সর্বাধিক গ্রহণ করে পানীয় জলের সাথে। ভূগর্ভস্থ জলে মিথাইল আর্সোনিক অ্যাসিড, ডাই মিথাইল আর্সিনিক অ্যাসিড, আর্সেনেট এবং আর্সেনাইট থাকে এবং এর মধ্যে তিনভাগের একভাগই আর্সেনাইট। একজন মানুষ প্রতিদিন গড়পড়তা দেড় লিটার জল পান করলে ০.০১৫ মি.গ্রা আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় গড়ে পানীয় জলের সাথে ০.০৭৫ মি.গ্রা. আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার জল পান করা মানুষ প্রতিদিন ০.৩-০.৭৫ মি.গ্রা. আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে। বোতলে ভরা মিনারেল ওয়াটারেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে ০.২ মি.গ্রা. আর্সেনিক পাওয়া গেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুসারে একজন মানুষের আর্সনিক দূষণের হাত থেকে বাঁচতে আর্সেনিক গ্রহণের মাত্রা প্রতি লিটার জলে সর্বাধিক ০.০১ মি.গ্রা হওয়া উচিত। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উত্যকায় নলকূপ থেকে সংগৃহীত জলে গড়ে ০.০৫ মি.গ্রা. বা তারও বেশী আর্সেনিক যৌগ পাওয়া যায়। এই মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার ৫ গুণেরও বেশী। এই কারণে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলে আর্সেনিকের সহণমাত্রা ঠিক করেছে ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার। অর্থাৎ গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে।

মানবদেহে আর্সেনিক যৌগগুলির প্রবেশের ক্ষেত্রে পানীয় জলের (বিশেষতঃ ভূগর্ভস্থ) প্রভাবই এর মধ্যে সর্বাধিক। আর্সেনিক যৌগগুলির মধ্যে জৈব পদার্থ হিসাবে (মূলতঃ খাদ্যের সাহায্যে) গৃহীত আর্সেনিকের তুলনায় অজৈব যৌগগুলির বিষক্রিয়া অনেক বেশী।

মানবদেহে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব

বায়ু, জল ও খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে গৃহীত আর্সেনিক যৌগগুলি কি প্রক্রিয়ায় শোষিত হয় সে সম্পর্কে গবেষণা এখনও চলছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শরীরে ৩-৪ গ্রাম আর্সেনিক পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা বাড়ে। এই শোষিত আর্সেনিক শরীরের নানা অংশে জমা থাকে যেমন যকৃৎ, বৃক্ক, ফুসফুস, প্লীহা, ত্বক। মানবদেহে সর্বাধিক আর্সেনিক থাকে চুল এবং নখে [কেরাটিন কলায় উচ্চমাত্রা সালফাইড্রিল (Sulfydryl) থাকার কারণে]। এছাড়া জরায়ু, হাড়, পেশী এবং অন্যান্য কোষেও আর্সেনিক যৌগ শোষিত হয়।

জলে দ্রবীভূত +৩ ও +৫ যোজ্যতা সম্পন্ন অজৈব আর্সেনিক যৌগ যেমন সোডিয়াম আর্সেনাইট ($NaAsO_2$) এবং ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন আর্সেনেট (Na_2HAsO_4) সহজে মানুষের শরীরে শোষিত হয়। মানব শরীরে As^{74} বিশিষ্ট আর্সেনিক অ্যাসিড ইনজেকশন করে দেখা গেছে যে তার ৫৮ শতাংশ ৫ দিনের মধ্যে মূত্রের সাথে বেড়িয়ে যায়। একই পরীক্ষায় এও দেখা গেছে যে ৭ দিনের মধ্যে ৬২ শতাংশ মূত্রের সাথে এবং ৬ শতাংশ অন্যান্য রেচন প্রক্রিয়ার সাথে নির্গত হয়। এই পরীক্ষাদ্বয় থেকে এটা প্রমাণ করা যায় যে মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র আর্সেনিক অ্যাসিড শোষণ করে ভাল মাত্রায়।

মানবদেহে আর্সেনিক +৩ (আর্সেনাইট) এবং আর্সেনিক +৫ (আর্সেনেট) কোথায় কি মাত্রায় শোষিত হয় তা এখনও ভালভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। মানবদেহে অজৈব As^{74} (যা কিনা তেজস্ক্রিয় মৌল) সমৃদ্ধ আর্সেনাইটের দ্রবণ ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন করে এবং আর্সেনেটের দ্রবণ মুখ দিয়ে খাইয়ে দেখা গেছে যে আর্সেনিক তিনটি অঙ্গে শোষিত হয় – বৃক্ক, যকৃত এবং পেশীতে। পেশীতে তা বেশীদিন স্থিতিশীল। গর্ভবতী মায়ের শরীর থেকে সন্তানের শরীরে প্ল্যাসেন্টার মাধ্যমে তা স্থানান্তরিত হয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে মানবদেহে আর্সেনিক +৩ এবং আর্সেনিক +৫ এর যৌগগুলির একটা মিথাইলেশন প্রক্রিয়ায় মূত্রের সাহায্যে শরীর থেকে বেড়িয়ে যায় আর অপর অংশ শোষিত হয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে। মানবদেহে জৈব আর্সেনিক যৌগগুলির ক্ষতিকর প্রভাব এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। পরীক্ষায় জানা গেছে যে অধিকাংশ জৈব যৌগ খাদ্য গ্রহণের ২-৩ দিনের মধ্যে শরীর থেকে অপরিবর্তিত রূপে বেড়িয়ে যায়। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে খাদ্যের (১০% আর্সেনিক জৈব যৌগ সমৃদ্ধ) মাধ্যমে গৃহীত আর্সেনিকের ০.৩% শরীরে শোষিত হয়। অধিকাংশ আর্সেনিক ডাইমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড হিসাবে নির্গত হয়। আবার শিশু ইঁদুরের (মাউস) তুলনায় বড় ইঁদুর (র‍্যাট) ৩০০ গুণ বেশি আর্সেনিক শোষণ করে। মানুষের শরীরের মূত্রের সাহায্যে যে মোনোমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড নির্গত হয় (আর্সেনাইট ও আর্সেনেট গ্রহণের পর) ইঁদুর, খরগোস বা বাঁদরের দেহ থেকে নিসৃত আর্সেনিক যৌগগুলির চেয়ে তা আলাদা।

আর্সেনিক +৩ এবং আর্সেনিক +৫ সমৃদ্ধ যৌগগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এবং রসায়নাগার তথা শিল্পজাত পণ্য থেকে মানবদেহে আসতে পারে (যেমন আর্সেনিকজাত ফসলে পোকামারার বিষ, কয়লা দহন অথবা ধাতু নিষ্কাশন)। আর্সিন (AsH_3) শিল্পজাত পণ্যের থেকেই একমাত্র মানবদেহে আসতে পারে যা খুবই বিষাক্ত। **গবেষণায় এটাও জানা গেছে যে তিন যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনিক যৌগ আর্সেনাইড ও আর্সেনাইট (+৩, –৩) পাঁচ যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনেট যৌগের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর।** বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে যৌগগুলির দ্রবণীয়তা (solubility), কণার মাপ (particle size), শোষণের হার (rate of absorption), বিপাক (metabolism) এবং রেচন (excretion) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদেহে বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগের বিষক্রিয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন এবং বিষক্রিয়ার মাত্রা (বেশী থেকে কম অনুসারে) যৌগগুলির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ঃ

১) আর্সিনস্

২) আর্সেনাইট (তিন যোজ্যতার জৈব এবং অজৈব –

প্রধানতঃ অজৈব)

৩) আর্সেনক্সাইড

৪) আর্সেনেট (অজৈব পাঁচ যোজ্যতার আর্সেনিক অ্যাসিড)

৫) আর্সোনিয়াম যৌগ আর্সেনোবেটাইন।

শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া কিভাবে হয় ?

শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া কিভাবে হয় তা নিয়ে বিগত ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আর্সেনিক, বিশেষতঃ তিন যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনাইট শরীরের সালহাইড্রিল (sulhydryl - SH) গ্রুপের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে। এর ফলে অক্সিডেটিভ সিস্টেমের (oxidative system) সাথে যুক্ত কলাগুলি আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বৃক্ক, যকৃত এবং ফুসফুস সহ বিভিন্ন অঙ্গের পর্দাগুলি এবং ত্বক। এর সামগ্রিক প্রভাবে কোষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক ক্ষরণ ব্যহত হয় যা ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে বাধা সৃষ্টি করে এবং কোষের শ্বসনে বাধা সৃষ্টি করে। পাঁচ যোজ্যতার আর্সেনিক is uncoupling mitochondrial oxidative phosphorylation। এটা ঘটে অজৈব ফসফেট আয়নের সাথে পাঁচ যোজ্যতার আর্সেনিক আয়নের ক্রমাগত প্রতিস্থাপনের ফলে এবং এর দ্বারা যে আর্সেনেট এস্টার সৃষ্টি হয় তা দ্রুত জলে দ্রবীভূত হয়। এই বিক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যহত হয়।

আর্সেনিক যৌগের বিষক্রিয়ার লক্ষণ এবং শরীরের ক্ষতি

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে মানব শরীরে যে প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখা যায় তা হল জ্বর, ডাইরিয়া, গা গুলানো, বমি বমি ভাব, সবসময় খিটখিটে ভাব, চুল পড়া ইত্যাদি। শিশুর শরীরে কয়েক সপ্তাহ ধরে ১.৩-৩.৬ মি.গ্রা./ প্রতিদিন আর্সেনিক গৃহীত হলে অথবা প্রাপ্ত বয়স্কের শরীরে প্রতিদিন ৩ মি.গ্রা. আর্সেনিক তিন সপ্তাহ ধরে গৃহীত হলেই এই লক্ষণগুলি সৃষ্টি হয়।

ধারাবাহিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ হিসাবে ত্বক বা চামড়ার মেলানোসিস, কেরাটোসিস, ডেসকোয়ামেশন এবং ফিনগার নেইল চেঞ্জ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ চামড়ায় কালো কালো দাগ (ব্ল্যাক ফুট ডিসিস), চামড়া খসখসে ও লালচে হওয়া, চামড়ায় ক্ষয় হওয়া এবং হাতে পায়ের নখ কালো হওয়ার মত ঘটনা ঘটে। এছাড়া রক্তের অসুখ হিসাবে রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া ও লিউকোপ্যানিয়া) দেখা যায়। লিভার বড় হয়ে যায়। পরীক্ষাগারে Fowler's solution (arsenic trioxide dissolved in Hcl, neutralised with KOH & diluted with chloroform water - containing 7.6g As/lit) গ্রহণের মাধ্যমে মানব শরীরে এই বিষক্রিয়া লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা এই শারীরিক লক্ষণগুলি – খাদ্য ও পানীয় জল থেকে গৃহীত আর্সেনিকের প্রভাবগুলি সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছেন।

অ্যানিমিয়া এবং লিউকোপ্যানিয়ার ফলে রক্ত এবং অস্থিমজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফোলিক অ্যাসিড বিপাকের বৃদ্ধির ফলে আর্সেনিক বিষক্রিয়া হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

অজৈব আর্সেনিক যৌগের প্রভাবে লিভারে কোষে ফ্যাট বৃদ্ধি, কোষের মৃত্যু এবং সিরোসিস হয়। এর ফলে প্রথমে শরীর হলুদবর্ণ হয় (জন্ডিস) এবং দীর্ঘ প্রভাবে মৃত্যু হয়।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় বৃক্কের নেফ্রোসিস হয়।

আর্সেনিক যৌগজনিত ক্যানসার রোগের ঘটনা মানুষ তথা বহু প্রাণীর দেহে দেখা গেছে।

আন্তর্জাতিক আর্সেনিক গবেষণা কেন্দ্র (IARC)-র বিজ্ঞানীরা ১৯৮০ সালে ঘোষণা করেছেন যে অজৈব আর্সেনিক যৌগ মানবদেহে চামড়া ও ফুসফুসে ক্যানসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। ধারাবাহিকভাবে অজৈব আর্সেনিক যৌগ মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতির পাশাপাশি ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের জন্ম হয়।

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ কিভাবে ঘটে ?

এটা আজ বিজ্ঞানীমহলে সর্বজনস্বীকৃত যে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল খাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের আর্সেনিক যৌগগুলির ক্ষেত্রে শিল্পজাত প্রভাব থাকলেও তা একেবারেই অপ্রধান, বরং প্রাকৃতিক প্রভাবই প্রধান। ভারতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা অঞ্চলগুলি (সংলগ্ন বাংলাদেশ সহ) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আর্সেনিক প্রভাবিত এলাকা হওয়া এই সত্যকেই প্রমাণ করে। বর্তমান ভারতে মুম্বাই ও গুজরাতের শিল্পাঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা কম হওয়াও উল্টোদিক থেকে তা প্রমাণ করে। এটা আজ প্রমাণিত যে পানীয় জলের মধ্যে নদী-পুকুর-জলাশয়ের জলে চেয়ে ভূগর্ভস্থ জলে বিষাক্ত আর্সেনিকের প্রভাব বেশী। তাই এবার চর্চা করা প্রয়োজন যে ভুগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ কি প্রক্রিয়ায় ঘটে।

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উৎপত্তিস্থল হল ভূত্বকের আর্সেনিক খনিজগুলি, যা পাথর এবং তার ক্ষয়কার্যের ফলে প্রথমে মাটিতে মেশে। অধিকাংশ গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে পাথরে আর্সেনিক খনিজ বেশী সেই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের মাত্রা বেশী এমনটা আদৌ নয়। ভূত্বকের উপরিতলে আয়রন (Fe) এবং অ্যালুমিনিয়াম (Al) (উভয়ই মাটিতে ভাল পরিমাণে থাকে) পলি থেকে আর্সেনিক শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ ঃ ১) বিশেষ কতগুলি বায়োজিওকেমিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োজন যা কঠিন আর্সেনিক যৌগ অথবা মিশ্রণকে ভূগর্ভস্থ জলে পাঠাবে। ২) ভূগর্ভস্থ জল ধারক স্তরে (aquifer) এই আর্সেনিক যৌগ সঞ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন এবং আর্সেনিক মিশ্রিত জল জলধারক স্তর থেকে ধুয়ে যাতে না যেতে পারে। প্রকৃতিতে এই দুটি অবস্থা সৃষ্টি হলে তবেই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক যৌগের আধিক্য ঘটে। বিজ্ঞানীরা তিনটি মডেলের অবতারণা করেছেন যা দ্বারা অ্যাকুইফারে আর্সেনিক সঞ্চয় প্রক্রিয়া বোঝা যায়।

১) মাটির নীচের যে অংশ জল দ্বারা সম্পৃক্ত তার উপরিতলকে ওয়াটার টেবিল বলা হয়। মাটিতে এর উপরের অংশ জল, বায়ু বা কোনও তরল দ্বারা অসম্পৃক্ত থাকে এবং এই অংশের মাটিতে বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। একে জোন অফ অক্সিডেশন বলে। ওয়াটার টেবিল-এর নীচের অংশ জল বা অন্য তরল দ্বারা সম্পৃক্ত হওয়ায় তাতে বায়ু থাকতে পারে না। একে জোন অফ রিডাক্শন বলে।

বৈজ্ঞানিকদের এক অংশের মতে জোন অফ অক্সিডেশন-এ আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজের দ্রুত জারণ হয়ে দ্রবীভূত As (III), সালফেট (SO_4^{2-}) এবং ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়া অক্সিজেনের যথেষ্ট উপস্থিতি এবং সালফাইড যৌগের জারণের হারের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে আর্সেনোপাইরাইট থেকে নিসৃত As(III)-এর একটা অংশ কিছু জীবাণুর সাথে ক্রিয়া করে As(V) দ্রবণ সৃষ্টি করে জারণের ফলে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হল ঃ

$$FeAsS + 13Fe^{3+} + 8H_2O \rightarrow$$
$$14Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 13H^+ + H_3AsO_4 \text{ (দ্রবণ)}$$

বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে জোন অফ অক্সিডেশন-এর সূর্যালোকের উপস্থিতি থাকে এবং তাতে জীবাণুগুলির বিক্রিয়ার হার অত্যন্ত কম হয় এবং সৃষ্ট আর্সেনেট দ্রবণ কম বিষক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফলে বর্তমানে জোন অফ অক্সিডেশন-এ আর্সেনিক সমৃদ্ধ দ্রবণ সৃষ্টির মডেলটি কার্যতঃ খারিজ হয়ে গেছে।

২) দ্বিতীয় মডেল অনুসারে রিডিউসিং অবস্থায় As সমৃদ্ধ আয়রন অক্সিহাইড্রক্সাইড (FeOOH) সৃষ্টি হওয়াকেই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দ্রবণ সৃষ্টির প্রধান কারণ বলা হয়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে জারিত অবস্থার জন্য এবং আয়রনের উপস্থিতির জন্য অজৈব আর্সেনিক প্রধানভাবে মাটির কণাগুলির উপর FeOOH এর আস্তরণ ফেলে দেয় জোন অফ অক্সিডেশন-এ। বায়ুমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির গভীরে যাওয়ার সাথে সাথে বিজারিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় জলে ভাসমান FeOOH এর আস্তরণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত হয়। মাটির নীচের পীট-এর (কলকাতা ও গঙ্গা উপত্যকার মাটির নীচের সর্বনিম্নমানের কয়লা) ফার্মেনটেশন হয়ে জৈব অণু (অ্যাসিটেট ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়। এই জৈব অণুগুলি FeOOH এর আস্তরণকে দ্রবীভূত করে Fe^{2+}, As^{3+}, As^{5+} সৃষ্টি করে যা আগে FeOOH এর অভ্যন্তরে ছিল। এইভাবে As^{3+}, As^{5+} আয়নগুলি জলে দ্রবীভূত হয়ে অজৈব আর্সেনাইট ও আর্সেনেট-এর দ্রবণ সৃষ্টি করে। নলকূপ থেকে উত্তোলিত জলের সাথে তা উঠে আসে এবং তা পান করার মাধ্যমে আমরা বিষাক্ত অজৈব আর্সেনিক পান করি। এক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হল ঃ

$$8FeOOH - As + CH_3COOH + 14H_2CO_3 \rightarrow$$
(কঠিন) (অ্যাসিটেট)
$$8Fe^{2+} + As + 16HCO_3^- + 12H_2O$$
(দ্রবণ)

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে অনুরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দ্রবণ প্রধানভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩) কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে মাটিতে As -এর নির্গমন এবং জলস্তরের ফসফেট যৌগমূলক ($H_2PO_4^-$) -এর সাথে তার আয়ন প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের নীচের স্তরে আর্সেনিক যৌগের মাত্রাবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই বিজ্ঞানীদের

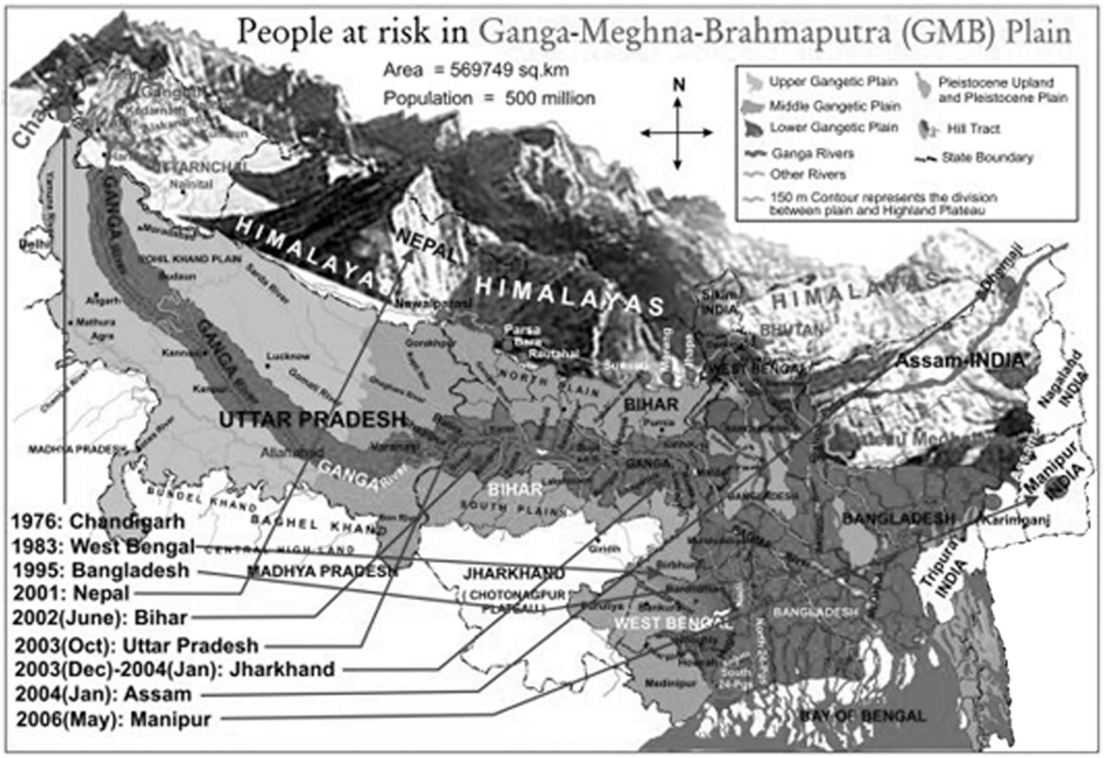

মতে মাটিতে ফসফেট ঘটিত সারের ব্যবহার বেশী হলে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। যদিও এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতান্তর আছে।

ভূগর্ভস্থ বা নদী-নালার জল আর্সেনিক যৌগ সমৃদ্ধ হতে পারে অন্য একটি প্রক্রিয়াতেও। আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গীরণের সাথে বহু সময় ম্যাগমা (মাটির নীচের লাভা) থেকে জল আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই আগ্নেয়গিরিজাত জলে আর্সেনিক সহ নানা অজৈব রাসায়নিক থাকে। এই জল নদী-নালা-জলাশয় বা ভূগর্ভে জমা হয়। এই জলে অজৈব আর্সেনিকের পরিমাণ অতিরিক্ত বেশী হয়। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি-তে এমন ঘটনা দেখা যায়।

ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকাই প্রধান আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চল হওয়ার কারণ কী ?

২০০৮ সালের ভারত সরকারের (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইড্রোলজি, রুরকি) তথ্য অনুসারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অসম, মণিপুর এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজনন্দগাঁও গ্রাম প্রধান আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশের এলাকাগুলি গঙ্গা এবং তার উপনদী ও শাখানদী উপত্যকায় অবস্থিত এবং অসমের জেলাগুলি ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদী উপত্যকা এবং মণিপুরের জেলাগুলি ইম্ফল নদী উপত্যকায় অবস্থিত। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১১১টি ব্লকের ৩৪১৭টি গ্রাম [মালদা, মূর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা (সুন্দরবন অঞ্চল বাদে), কলকাতা, কোচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকা, হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান জেলার ভাগিরথীর পাড় লাগোয়া অঞ্চল পড়েছে] প্রবল আর্সেনিক প্রবণ, বিহার রাজ্যের ১৫টি জেলার ৫৭টি ব্লকের ১ কোটি মানুষ আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে বসবাস করেন। উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার ২৫টি গ্রাম, ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার ১৭টি গ্রাম, অসমের দুটি জেলা; মণিপুরের ইম্ফল নদী উপত্যকা এবং ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও গ্রাম আর্সেনিক প্রবণ। এর মধ্যে ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও, বিহারের দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া এবং কিষেণগঞ্জ, পঞ্জাব-হরিয়ানার চন্ডীগড় অঞ্চল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া অন্য সমস্ত অঞ্চলগুলিই গঙ্গা-ভাগিরথী, ব্রহ্মপুত্র বরাক এবং ইম্ফল

নদী উপত্যকায় পড়ে। এই সমগ্র অঞ্চলের ৫২৯৬৭৪ বর্গ কিমি অঞ্চলের ৩৬ কোটি মানুষ বসবাস করেন, যার মধ্যে ৮৮৬৮৮ বর্গ কিমি অঞ্চলের ৫ কোটি মানুষ এমন এলাকায় বাস করেন যে অঞ্চল (বাংলাদেশের পদ্মা-যমুনা নদী উপত্যকা সহ) পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক প্রবণ ও বিপদসঙ্কুল। চন্ডিগড় শহর থেকেই প্রথম আর্সেনিকোসিক আক্রান্ত রুগীর খবর পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিকের সহণমাত্রা ঠিক করেছেন ০.০১ মি.গ্রা./লিটার। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সহণমাত্রা ৫ গুণ বাড়িয়ে করেছে ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার। উপরে উল্লিখিত সমগ্র অঞ্চলগুলিই হু নির্ধারিত সহণমাত্রার উর্ধ্বে। ভারতের ওই ৭টি রাজ্যের ১,৬৯,৬৯৮টি হস্তচালিত নলকূপ থেকে নেওয়া জলের সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে এর মধ্যে ৪৫.৯৬% নলকূপের জলে ০.০১ মি.গ্রা./লিটার-এর অতিরিক্ত আর্সেনিক আছে, ২২.৯৪% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার-এর অতিরিক্ত এবং ৩.৩% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ০.৩ মি.গ্রা./লিটার (হু নির্ধারিত মাত্রার ৩০ গুণেরও অতিরিক্ত)। এই পরীক্ষাগুলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি-তে হয়েছে। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড (সি জি ডব্লিউ বি), পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের রাজ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড-ও এই নিয়ে প্রচুর সমীক্ষা করে একই ধরনের ফলাফল পেয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে কৃষি অতি উন্নত এবং পর্যাপ্ত সেচখালের অভাবে অধিকাংশ এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। চাষে আর্সেনিক দূষিত জল ব্যবহারের ফলে এই আর্সেনিকের একাংশ কৃষিজ ফসলে শোষিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে শাক সব্জীর পর ধানই সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক শোষণ করে। এই অঞ্চলে ধান চাষই প্রধান। তাই উৎপাদিত ফসল থেকে আর্সেনিক যৌগগুলি অন্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে বাজারে বিক্রির পর।

এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক গ্রহণের ফলে যে যে শারীরিক লক্ষণগুলি দেখা গেছে সেগুলি হল ঃ

১) রোদ লাগলে ত্বকে জ্বালা, পোড়া এবং চোখ দিয়ে জল পড়া, ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, দুর্বলতা, কর্মে অনীহা এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া;

২) ধারাবাহিক শ্বাসকষ্ট। সর্দিসহ বা সর্দি বিহীণ লাগাতার কাশি লক্ষ করা যায় ৫০% ক্ষেত্রে,

৩) পৌষ্টিকতন্ত্রের সমস্যা,ক্ষুধামন্দ, বমি বমি ভাব, জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হওয়া, পেটে ব্যাথা, লিভার ও প্লীহা বড় হওয়া এবং পেটে জল জমা;

৪) অল্প থেকে বড় ধরনের অ্যানিমিয়া লক্ষ করা গেছে অনেক ক্ষেত্রে;

৫) হাতে পায়ে ঘা হওয়া লক্ষ করা গেছে অল্প কিছু ক্ষেত্রে।

এইসব শারিরীক কষ্টগুলি প্রতিটি এলাকার মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়ছে এবং অনেকেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উৎস কী ?

এই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক প্রবণ হওয়ার প্রধান কারণ যে প্রাকৃতিক সেটা আগেই বলা হয়েছে। বিস্তারিত গবেষণায় জানা গেছে যে এই অঞ্চলের নবীন পলি এবং বিশেষতঃ তা ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটি (Holocene sediment, ১২ হাজার বছর পর্যন্ত সময়ের) বালি, মিহি বালি (silt) এবং কাদা দিয়ে তৈরী। এই পলিতে অজৈব আর্সেনিক আসতে পারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে ঃ

(১) রাজমহল বেসিনের গন্ডোয়ানা কয়লা (পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম এবং ঝাড়খন্ডের রাজমহল অঞ্চল) যেমন সাহেবগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকে। এই কয়লায় প্রতি কেজিতে ২০০ মি.গ্রা. আর্সেনিক আছে।

(২) বিহার-ঝাড়খন্ড মাইকা বেল্ট (বিহারের মুঙ্গের – গয়া এবং ঝাড়খন্ডের কোডার্মা অঞ্চল) থেকে। এই মাইকা পেগমাটাইট পাথরে ০.০৮ - ০.১২% আর্সেনিক আছে।

(৩) প্রোটেরোজোয়িক যুগের বিন্ধ্য পর্বতের পাইরাইট খনিজ সমৃদ্ধ শেল পাথর থেকে। এই পাইরাইট সমৃদ্ধ শেল পাথরে ০.২৬% আর্সেনিক আছে।

(৪) সোন উপত্যকার পাথর (শেল) এবং মাটি থেকে। এই উপত্যকার পাথর ও মাটিতে ২.৮% আর্সেনিক আছে।

(৫) দার্জিলিঙ, নেপাল, সিকিম, হিমালয়ের এবং গরুবাথান অঞ্চলের সালফাইড সমৃদ্ধ (পাইরাইট, আর্সেনোপাইরাইট) পাথর থেকে। এইসব পাথরে ০.৮% আর্সেনিক আছে। **অধিকাংশ বিজ্ঞানী উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান**

উৎসের মধ্যে হিমালয়কেই প্রধান উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (ম্যাক আর্থার এবং তাদের সহযোগী, ২০০৪)।

এইসব অঞ্চলের পাথরের মধ্যে থাকা আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজগুলি বিভিন্ন ছোট বড় ঝর্ণা, নালা ও নদীর সাথে নেমে আসছে হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলের কোয়াটারনারি (২৫ লক্ষ বছর সময়ের) পলিতে। মাইকাসমৃদ্ধ এইসব পলি, বালি, নুড়ি এই ব-দ্বীপে জমা হচ্ছে। এই পলি বিস্তারের ক্ষেত্রে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে নিয়ে আসছে গঙ্গা এবং তার শাখা নদী ভাগিরথী এবং হুগলী। উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে নিয়ে যাচ্ছে পদ্মা (গঙ্গার প্রধান শাখা)। উত্তর থেকে দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছে মেঘনা (পদ্মার প্রধান উপনদী) নদী। উত্তর পূর্ব থেকে নিয়ে আসছে যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের নাম বাংলাদেশে) দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।

বিজ্ঞানীরা এটাও প্রত্যক্ষ করেছেন যে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলির নবীন পলিতেই আর্সেনিক সঞ্চয় হচ্ছে। এছাড়া যে অঞ্চলে একাধিক অ্যাকুইফার আছে এবং সেগুলির মধ্যবর্তী অভেদ্য অ্যাকুইক্লুড বা অ্যাকুইটার্ড দ্বারা পৃথকীকৃত সেখানে উপরের অ্যাকুইফারে আর্সেনিক আছে কিন্তু নীচের অ্যাকুইফারে নেই। অঞ্চলভেদে ৩৫০-২০০০ ফুট বা তারও গভীর অ্যাকুইফারে সাধারণত আর্সেনিক পাওয়া যায় না সাধারণতঃ। তবে যে অঞ্চলে এই বিভিন্ন অ্যাকুইফারগুলি সংযুক্ত সেখানে প্রথমদিকে নীচের অ্যাকুইফারে আর্সেনিক না থাকলেও পরবর্তীকালে (দীর্ঘ ব্যবহারে) সেখানে আর্সেনিক পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এটা আজ প্রমাণিত যে ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকার নবীন পলিতেই আর্সেনিক-এর পরিমাণ সহনমাত্রার অতিরিক্ত। এই পলিগুলি সবই অসংখ্য নদী-নালার সাহায্যে হিমালয় ধৌত হয়ে সমভূমিতে আসছে। আজ আমরা হিমালয়ের যা উচ্চতা দেখছি অতীতে তা ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিমালয়ের উচ্চতা বাড়ছে এবং নদীগুলির গতিপথও পরিবর্তন হচ্ছে। হিমালয়ের মধ্যে আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজগুলি যে পাথরে বেশী পরিমাণে আছে উচ্চতা বাড়ার ফলে তার অধিকাংশ মাটির উপর উত্তোলিত হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে কোয়াটারনারি যুগের (আজ থেকে ২৫ লক্ষ বছর) একদম শেষ পর্যায় অর্থাৎ **হলোসিন যুগে (আজ থেকে ১২ হাজার বছর) অর্থাৎ শেষ বরফযুগের পর আর্সেনিক যৌগগুলির ধৌতকরণ বেড়েছে এবং বর্তমান গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র নদীখাত বরাবর তা সমভূমিতে নেমে আসছে এবং সঞ্চিত হচ্ছে।** এই কারণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তথা হিমালয় ধৌত নদীগুলির

নবীন পলিতেই আর্সেনিক সঞ্চয় হয় সবচেয়ে বেশী এবং বিগত ১২ হাজার বছরে এই পলি যত গভীর পর্যন্ত সঞ্চিত হয়েছে সেইস্তর এবং তার কিছুটা নীচের স্তরের অ্যাকুইফারে তা সঞ্চিত। এর চেয়ে প্রাচীন পলিতে আর্সেনিকের মাত্রা অনেক কম। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলের রাঢ় মাটিতে এবং তার নীচের জলস্তরে (মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মূর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চল) আর্সেনিকের মাত্রা কম।

৩০ বছর আগে এদেশে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষ দেখা যেত না কেন?

এদেশে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ অতীতে নদী-নালা-পুকুর বা জলাশয়ের জলই প্রধানতঃ পান করতেন। বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিতে নদীর জল বা জলাশয়ের জল সরবরাহ করা হত। এই জলের নানা প্রকার জীবাণু থাকায় এবং সাধারণত ছাঁকনিতে তা পরিশুদ্ধ না হওয়ায় নানারকম পেটের অসুখ, জন্ডিস ইত্যাদি লেগেই থাকত এবং কখনও কখনও তা মহামারির রূপ ধারণ করত। বিভিন্ন সাহিত্য-উপন্যাসে আমরা যার কথা পাই। পরবর্তীতে বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার হওয়ায় জল ফুটিয়ে, ফটকিরি বা ক্লোরিন দিয়ে শুদ্ধ করে খাওয়ার কথা প্রচার হয়। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষের তা আয়ত্বের মধ্যে না থাকায় প্রচারে কাজ হত না। গত শতাব্দীর সাত-এর দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের প্রকল্পগুলি আসতে থাকে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের নামে। এই সময়ই দেশী-বিদেশী টাকায় পরিশুদ্ধ জল হিসাবে নলকূপের জল খাওয়ার কথা সরকার ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি প্রচার করে। গ্রামে গ্রামে নলকূপ খনন শুরু হয়। দেখতে দেখতে প্রতিটি গ্রামে এবং এমনকি প্রতিটি পাড়ায় নলকূপ বসতে থাকে। দেশের মানুষকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে প্রশংসা করা হয়। তখন জানা ছিল না, ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে। বিগত শতাব্দীর আট-এর দশক থেকেই এর ফল ফলতে শুরু করে। কোথাও ফ্লুয়োরাইড, কোথাও ক্যাডমিয়াম আবার কোথাও আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাব ফুটে উঠতে শুরু করে। যেহেতু শরীরে অজৈব আর্সেনিক যৌগগুলি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় না পৌঁছালে তার প্রভাব ধরা পড়ে না এবং একজন মানুষ টানা ৮-১০ বছর এই জল সেবন না করলে সাধারণতঃ এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাই নলকূপ প্রকল্পগুলি লাগু হওয়ার প্রায় এক দশক পর থেকেই এর ভয়াবহতা নজরে এসেছে। **ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আগেও ছিল কিন্তু মানুষ সেই জল পান না করায় এই রোগে অতীতে আক্রান্ত হয়নি।**

পানীয় জল থেকে আর্সেনিক দূষণ মুক্তির উপায় কী ?

বিজ্ঞানীরা পানীয় জল থেকে আর্সেনিক মুক্তির চারটি উপায়ের কথা বলেছেন। সেগুলি হল ঃ

১) মাটির নীচের জলধারক স্তরে (অ্যাকুইফার) আর্সেনিক শোধন (insitu remediation);

২) প্রযুক্তির সাহায্যে নলকূপ থেকে উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্তকরণ (ex-situ remediation);

৩) আর্সেনিক দূষিত ভূগর্ভস্থ জলের বিকল্প হিসাবে নদী, পুকুর বা অন্যান্য জলাশয় থেকে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ (use of surface water);

৪) গভীর বা অতিগভীর আর্সেনিক মুক্ত জলধারক স্তর থেকে আর্সেনিকমুক্ত ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ (safe aquifer for supply of arsenic free water)।

মাটির নীচের জলধারক স্তর থেকে আর্সেনিক শোধন সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি মানা হলেও সেই বিষয় অর্থ-পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের অভাবে তা নিয়ে গবেষণা বেশীদূর এগোয়নি।

প্রযুক্তির সাহায্যে আর্সেনিক যুক্ত ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক শোধনের নানা পদ্ধতি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে লাগু হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে কম-বেশী আর্সেনিক শোধন করা যাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ জলের বদলে নদী, পুকুর বা অন্য জলাশয় থেকে (surface water) পানীয় জল সরবরাহ (যা বর্তমানে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিগুলি করে থাকে) যুক্তিসঙ্গত হলেও সর্বত্র এই ধরনের জলের উৎস নাই যা থেকে সাধারণের পানীয় জলের সমস্যা মিটতে পারে। উপরন্তু এই সারফেস ওয়াটার-এ নানা ধরনের জীবাণুর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। এই জল সরাসরি পান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডায়রিয়া, জন্ডিস, কলেরা ইত্যাদি অসুখ এতে দেখা যায়। সঠিক পরিশোধন প্রক্রিয়া ছাড়া এই জল সরবরাহ মহামারী সৃষ্টি করে থাকে।

আর্সেনিক মুক্ত জলস্তর থেকে নলকূপের সাহায্যে আর্সেনিকমুক্ত ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ আর একটি যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসঙ্গত প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমগ্র এলাকার বিস্তৃতভাবে জলস্তরের হিসাব (গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যাপিং), ভূত্বক থেকে

আর্সেনিক মাটির নীচে মিশ্রিত (mobilization) হওয়া সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এমন অ্যাকুইফার বাছতে হবে যা আর্সেনিকমুক্ত এবং তা অবশ্যই নীচের বা উপরের আর্সেনিকযুক্ত অ্যাকুইফার থেকে অভেদ্য অ্যাকুইক্লুড দ্বারা পৃথকীকৃত। তা না হলে আর্সেনিকমুক্ত অ্যাকুইফারের থেকে দীর্ঘদিন জল উত্তোলিত হওয়ার পর সেই অ্যাকুইফার আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই অভিজ্ঞতা দেখা যায়।

এর জন্য যে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রয়োজন তা সঠিকভাবে কোথাও লাগু হয় নি। স্থানীয়ভাবে কয়েকটি অঞ্চলে সরকারীভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেই ধরনের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপই খনন করা হয়েছে।

পানীয় জল থেকে আর্সেনিক মুক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়টিই অর্থাৎ ex-situ remediation বা প্রযুক্তির সাহায্যে উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্তির প্রক্রিয়াটিই প্রধানভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে লাগু হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর এই প্রক্রিয়াগুলিতে দেশী-বিদেশী নানা কোম্পানী এবং সরকার বিনিয়োগ করেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলাদেশের নানা অঞ্চল, নেপাল প্রভৃতি রাষ্ট্রে এইসব প্রযুক্তি বর্তমানে লাগু হচ্ছে। এর প্রাথমিক ফলাফল কোথাও অল্প, কোথাও মাঝারি আবার কোথাও বেশ ভাল।

উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্তির নানা প্রযুক্তি

এখনও পর্যন্ত ১০ ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা গেছে। এগুলির কার্যকারিতা বিভিন্ন রকমের।

উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক যৌগ পৃথকীকরণ প্রশ্নে নানা ধরণের প্রযুক্তি চালু আছে সেগুলি – জারণ, যৌথ অধঃক্ষেপণ, অধিশোষণ, আয়ন প্রতিস্থাপন রিভার্স অসমোসিস এবং মেমব্রেনস পদ্ধতি অনুসারে করা হয়। ফিল্টার হিসাবে সক্রিয় অ্যালুমিনা, রেসিন, দানাদার ফেরিক হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কয়েকটি জটিল এবং সময় অন্তর রাসায়নিক মিশ্রণ করা, ফিল্টার ধৌতকরণ ও বদল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে, দেশী ও বিদেশী প্রযুক্তির সাথে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের নানা স্থানে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। অল্প কিছু প্ল্যান্টে এই প্রকল্পের ভাল সাফল্য পাওয়া গেছে। প্রধানভাবে জলে দ্রবীভূত আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম

আর্সেনিক পরিশুদ্ধ নলকূপের জল নিচ্ছেন জনৈক মহিলা

আর্সেনাইটকে আর্সেনেট দ্রবণের অধঃক্ষেপ তৈরী করে পৃথকীকরণ করার কাজটাই হয়ে থাকে।

ফিল্টার করা আর্সেনিক যৌগ পরিবেশ থেকে পৃথকীকরণ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ জল থেকে পৃথকীকৃত আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষিত যৌগগুলি যদি যেখানে সেখানে ফেলা হয় তবে আবার তা ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করবে এবং যেখানে ফেলা হবে প্রাথমিকভাবে সেখানে দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থকে প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে দ্রবীভূত করা হয় তারপর ধাতুর টুকরোর সাথে সুবিধাজনক বিজারক দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করে তাকে বাষ্পীভূত করা হয় এবং আর্সেনিক গ্যাস তৈরী করে ছাড়া হয় বায়ুমন্ডলে। এতে প্রাথমিক দূষণ মুক্ত হলেও ওই গ্যাস পুনরায় প্রকৃতিতে আসেনাইট ও আর্সেনেট যৌগ গঠন করে জল পুনরায় দূষিত করতে পারে বা বাতাসের সাহায্যে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া হল জারক ক্ষারীয় মাধ্যমে এনে সোডিয়াম আর্সেনেট বা

ক্যালসিয়াম আর্সেনেট প্রস্তুত করা, যা কাঁচ শিল্পের প্রয়োজনীয় পদার্থ। **পরিকল্পনা ও অর্থের অভাবে** এই প্রক্রিয়া প্রায় কোথাও লাগু হয় নি। প্রকল্প রূপায়করা প্রাথমিকভাবে ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্ত করেই ক্ষান্ত হন এবং বর্জ্য পদার্থ কোন গর্ত করে রাখা হয়, তাতে কংক্রিট মিশিয়ে আর্সেনিক কংক্রিট বানানো হয় অথবা আর্সেনিক মিশ্রিত মাটি দিয়ে ইঁট তৈরী করা হয়।

ভারতের ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্তি ঘটানোর প্রক্রিয়া রূপায়ন

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে এর প্রভাব বেশী হওয়ায় এখানে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন এন জি ও (নেচার ক্লাব এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন সহ) এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছে এবং তা রূপায়ন করা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্র সরকার এবং নানা এন জি ও নানা প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ন করেছে। কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার ২০০৫-এ, এ রাজ্যে আর্সেনিক দূষণ মুক্তির জন্য ২১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই টাকায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, এন জি ও, নানা দেশী-বিদেশী কোম্পানির সাহায্যে নানা প্রকল্প নিয়েছে। প্রথমতঃ গ্রামের কোন্ নলকূপটি থেকে সহনমাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায় তা চিহ্নিতকরণ (লাল রঙ তরে দেওয়া), বিভিন্ন গবেষণাগারে জল পরীক্ষা করা, বিকল্প জলের সন্ধান করে তা সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা, আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ খনন করা এবং ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক মুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা, গণসচেতনতার কার্যক্রম গ্রহণ করা ইত্যাদি।

তবে আর্সেনিক নিয়ে এত আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে কেন?

ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিক নিয়ে সরকার, এন জি ও এবং সংবাদমাধ্যমের প্রচারে প্রবল আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের এবং সরকারের আর্সেনিক সমস্যার উৎস, কারণ এবং সমাধানের উপায়-পদ্ধতি কোনটাই অজানা নয়। হাতে-কলমে পরীক্ষা দ্বারা তা পরীক্ষিত এবং সকল বিজ্ঞানী মহল এবিষয়ে ওয়াকিবহাল। সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলও (পঞ্চায়েত - ব্লক - জেলা স্তরের আধিকারিক - মন্ত্রী - আমলা) এবিষয়ে কম বেশী সচেতন। তবুও আর্সেনিক নিয়ে গ্রামে গঞ্জে নানা আতঙ্ক আছে। আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে দায়ী করা হচ্ছে। যে বিষয়গুলি প্রধানভাবে প্রচারে আসছে এবং মানুষকে দায়ী করা হচ্ছে তা হল ঃ

১) নলকূপের জল খাওয়া বিপজ্জনক। সারফেস ওয়াটার বা নদী-পুকুর-জলাশয়ের জল শুদ্ধ করে খাওয়া উচিৎ অথবা বোতলজাত জল কিনে খাওয়া উচিৎ। অথচ আমরা জানি নদী-পুকুরের জল শুদ্ধ না করে খাওয়া বিপদ্‌জনক। এগুলির থেকে ডাইরিয়া, কলেরা, জন্ডিসের মত অসুখের সম্ভাবনা বেশী। ব্যক্তিগতভাবে এই জল শুদ্ধ করে খাওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বোতলের জলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্সেনিক এবং জীবাণু দুইই পাওয়া যায় (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট তাই বলছে)। তাছাড়া ওই জল কিনে খাওয়ার প্রস্তাব দেশের মুষ্টিমেয় ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও শতকরা ৯৫ ভাগের ক্ষেত্রে অসম্ভব।

২) কৃষকেরা গরমের সময় অধিক ফলনশীল (বোরো চাষ) করছেন। এই চাষে অধিকাংশ চাষীরা অতিরিক্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করছেন। এর ফলে নাকি যেমন ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের মাত্রা বাড়ছে তেমনই ফসলে আর্সেনিক দূষণ বাড়ছে! আর্সেনিক প্রবণ নয় এমন এলাকাগুলিতেও বিক্রি হওয়া ফসল আর্সেনিক দূষণ ছড়াচ্ছে, তাই গরমের চাষের সময় বিভিন্ন সরকারী মহল ও এনজিও'রা ফসলের কাজে স্যালো (অগভীর নলকূপ) ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবী তুলছেন এবং অতিরিক্ত ব্যবহারকারীদের শাস্তি দেওয়ার হুমকী দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হল কৃষকেরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল চাষ না করে প্রকৃতি নির্ভর চাষ করবে – এটা কি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল কথা? প্রকৃতি নির্ভর কৃষির বদলে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্যই তো কৃষি জমির পরিমাণ অনেক কমে গেলেও আজ মানুষের প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত ফলন হচ্ছে। আর যে সব জমিতে খাল-বিলের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে মানুষ বেশী জ্বালানি পুড়িয়ে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করতে যায় কী? আর্সেনিক অধ্যুষিত গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র সমভূমি এলাকা খরা এলাকা নয়। এখানে গড় বৃষ্টিপাত বেশী এবং প্রায় প্রতিবছরই কোন কোন অঞ্চলে বন্যা হয়। এখানে উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে কোনও চাষীই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করবে না। সুতরাং ১৯৪৭ সালের পর ৬৬ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে না তুলতে পারার কারণেই ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার

বাড়ছে। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা না হলে কৃষকদের দায়ী করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দ্রবণ সৃষ্টির কারণ চর্চার সময় আমরা দেখেছি যে আজ পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন যে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনে মাটির জলস্তর নেমে গেলে জোন অফ অক্সিডেশন বেড়ে গেলেও জলে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি হয় না। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক যৌগগুলি দ্রবীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া চলে জলস্তরের নীচে জোন অফ রিডাকশন-এ। সুতরাং এই বিজ্ঞান জানার পরও কৃষকেরা শ্যালোর সাহায্যে জল উত্তোলনে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক বাড়ছে এই মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক প্রচার হচ্ছে কেন? হচ্ছে তার কারণ – এর দ্বারা সরকার তথা সমাজের পরিচালকবর্গ আর্সেনিকের প্রভাবে মারণরোগ সৃষ্টির দায় থেকে রেহাই পান। তাছাড়া শ্যালোর সাহায্যে জল উত্তোলনের ফলে যদি আর্সেনিক দূষণ বাড়ত তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও হুগলী জেলায় আর্সেনিকের প্রকোপ বেশী হত। কারণ এখানেই বোরো চাষ বেশী হয় শ্যালোর ব্যবহার করে। এছাড়া এটা সকলেরই জানা আছে যে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনে সাধারণভাবে সাময়িকভাবে জলস্তর নেমে গেলেও জলচক্রে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূগর্ভে আবার জল ফিরে যায় (রিচার্জ হয়) এবং জলস্তর আবার উঠে আসে। প্রতিবছর একটি অঞ্চলে যেমন এই ঘটনা ঘটে তেমনই একটা সময় অন্তর সর্বত্রই তা ঘটে। জলস্তরের পরিবর্তন একটা গতিশীল সাম্য অনুসারে চলে এই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ধারণা ব্যাতিরেকে বিচার তাই অধিবিদ্যক।

৩) আধুনিক উচ্চ ফলনশীল চাষ করতে গিয়ে কৃষকেরা অতিরিক্ত অজৈব সার ব্যবহার করছেন। এতে জমি খারাপ হচ্ছে এবং জলে আর্সেনিক এবং অন্যান্য দূষণ বাড়ছে। সরকারের বিভিন্ন মহল, এনজিও এবং পরিবেশবাদীরা এই প্রচার জোরে সোরে চালাচ্ছে। কিন্তু এর বিকল্প কী? এর বাস্তব বিকল্প কৃষকদের কাছে নিয়ে গেলে এবং তা ফলদায়ী এবং কম খরচের হলে তা তো এতদিনে কৃষক সমাজ গ্রহণ করেই নিত। এইসব পরিবেশবাদী প্রচার আসলে প্রগতির লক্ষ্যে নয়, অজৈব প্রযুক্তির বদলে জৈব প্রযুক্তির পক্ষে প্রচার। যে বাজার মুখী কৃষির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নিরন্তর ঘটে চলেছে তার গতি রুদ্ধ করার প্রচার। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের প্রধান উৎস যেখানে প্রাকৃতিক বলে প্রমাণিত সেখানে এই সব পরিবেশবাদী প্রচার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সবচেয়ে বড় কথা হল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকায় মানুষের জীবনে আর্সেনিক সমস্যার জন্য দায়ী কে? সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে জনসাধারণকে নলকূপের জল খাইয়ে আর্সিনোকোসিসে আক্রান্ত করা হয়েছে। এখন নলকূপ ব্যবহারের জন্য মানুষের সচেতনতা নাই বলা হচ্ছে। রাষ্ট্র নিজের দায় ঝেড়ে ফেলে আক্রান্ত অসহায় মানুষকে দোষারোপ করছে।

সমাধানের পথ কী?

পানীয় জলে আর্সেনিকের উৎস কী? ভূগর্ভস্থ জলে তা মিশ্রিত হওয়ার কারণ কী? এই ভূগর্ভস্থ জল থেকে আর্সেনিক মুক্তির উপায় কী এগুলি আমরা বিস্তৃতভাবে জানলাম। এগুলি জানার পর এবং আর্সেনিক (ও নানা রাসায়নিক) ও জীবাণু মুক্ত পানীয় জল পাওয়ার বিজ্ঞান সম্মত উপায় জানার পর এটাকে অসমাধানযোগ্য বলা যায় কী ? প্রশ্ন হল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সরকার সমস্যার মোকাবিলা করতে চায়, কি চায় না? কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, কারণ এটা বিস্তীর্ণ এলাকার সামাজিক সমস্যা। বিগত ২ দশকে এনিয়ে প্রচুর গবেষণা, প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রচার হয়েছে। এর জন্য দেশের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার (বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের টাকায়) হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। বেসরকারী-অসরকারী নানা দেশী-বিদেশী সংস্থা এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছে। কিন্তু ফল কী ফলেছে? বিস্তীর্ণ এলাকার ৯০ ভাগ মানুষ আজও আর্সেনিক যৌগ সমৃদ্ধ (সহনমাত্রার ৫ গুণ, ১০ গুণ বা তারও বেশী) জল এখনও পান করে চলেছেন। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এই 'সেঁকো বিষের' প্রভাবে অসুস্থ হচ্ছেন, জীবনীশক্তি হারিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন। সরকার ও বেসরকারী কোম্পানি এবং এনজিওদের উদ্যোগে আর্সেনিক মুক্ত ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেই পণ্য কেনার ক্ষমতাসম্পন্ন বাড়িগুলিতে যেখানে সরকারী আধিকারিকরা থাকেন এমন আবাসন – থানা – প্রশাসনিক ভবন এবং কয়েকটি স্কুল – কলেজে, অন্যত্র নয়। এছাড়া পৌর এলাকাগুলিতে বাড়ি বাড়ি পরিশুদ্ধ সারফেস ওয়াটার সরবরাহের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক ও সরকারের জলকর বসানোর প্রস্তাব পৌর এলাকাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। আর গ্রাম-শহরের অলিতে গলিতে

● *শেষাংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়* ➔

ডঃ ডি. এন. গুহ মজুমদারের সাক্ষাৎকার

বিষয় ঃ আর্সেনোকোসিস

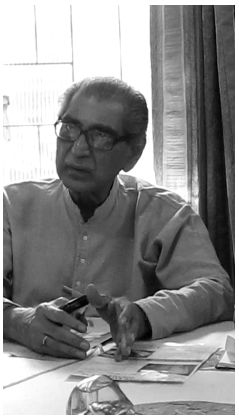

[ডঃ ডি এন গুহ মজুমদার কলকাতার এস এস কে এম বা পিজি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টোলজির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি বহু বেসরকারী হাসপাতালের সাথে যুক্ত। বিজ্ঞানমনস্ককে তিনি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। সেই মতো সাক্ষাৎকার টীম ওনার কাছে পৌঁছোয়। প্রায় ১ ঘন্টা ব্যাপী সাক্ষাৎকারটি শুধু বিজ্ঞান মনস্ককেই নয়, বহু সাধারণ পাঠককে সমৃদ্ধ করবে এ আমাদের স্থির বিশ্বাস – সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

● বিজ্ঞান মনস্ক ঃ প্রথমেই জানতে চাইব, আর্সেনোকোসিস কাকে বলে?

ডঃ ডি.এন.গুহ মজুমদার ঃ আর্সেনিকের প্রভাবে শরীরে যে অসুস্থতা দেখা দেয় তাকে আর্সেনোকোসিস বলে। এই অসুস্থতা সাধারণত চর্মরোগ হিসাবে প্রকাশিত হয় যা দেখে বোঝা যায় আর্সেনোকোসিস হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আর্সেনিকের অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য ঠিক এই সংজ্ঞাটা দিয়েছে – পিগমেন্টেশন অর কেরাটোসিস।

● বি. ম. ঃ এব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলবেন?

ডঃ গুহ মজুমদার ঃ গায়ে ছিটছিটে দাগ হওয়াকে বলে পিগমেন্টেশন, হাতে ও পায়ের চামড়া শক্ত খসখসে হয়ে যাওয়াকে 'কেরাটোসিস' বলে। এর কতগুলো বিশেষত্ব আছে। এক্ষেত্রে চামড়া শক্ত, খসখসে হয়ে যাওয়া ও হাতে বা পায়ের তলায় গুটি দেখা দেওয়া, ছিট ছিটে দাগ শরীরের দুপাশেই বুকে, হাতে, পায়ে হয়। এছাড়া পশ্চিমবাংলার আমরা গবেষণা করে দেখেছি প্রধান যে সমস্যাটা দেখা দেয় তাহল ফুসফুসের রোগ। অনেকে শ্বাসকষ্টে ভোগেন যাকে বলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। এছাড়া আরো যে সমস্ত রোগ হয় আর্সেনিক থেকে তা হল নার্ভের রোগ বা নিউরোপ্যাথি। এই রোগ হলে হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করে।

● বি. ম. ঃ কিন্তু বোঝা যাবে কিভাবে যে এই অসুখ আর্সেনিকের প্রভাবেই হচ্ছে? হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ কিংবা কাশি তো অনেকেরই থাকে।

ডঃ গুহ মজুমদার ঃ সেটা চট্ করে বোঝা যায় না ঠিকই, কারণ এই লক্ষণগুলো অনেকেরই থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে আর্সেনিক যুক্ত জল যারা বহুদিন ধরে পান করছে, তাদের এই ধরনের অসুস্থতা বেশী হচ্ছে। এপিডেমোলজিক্যাল সার্ভে করে দেখা গেছে তুলনামূলক একই অঞ্চলে যারা আর্সেনিকযুক্ত জল পান করে না, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অসুস্থতা কম দেখা দেয়।

● বি. ম. ঃ হু যেমন পানীয় জলে আর্সেনিকের সহনমাত্রা ঠিক করেছে ০.০১ মি.গ্রা. / লিটার। এই ধরনের নির্ণয়ের পদ্ধতিতে কি ল্যাবরেটরিতে ঐ পরিমাণ আর্সেনিক জলে দ্রবীভূত করে স্যাম্পেল তৈরী করা হয় নাকি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলের স্যাম্পেল নেওয়া হয়?

ডঃ গুহ মজুমদার ঃ না না, ল্যাবরেটরিতে আর্সেনিক মিশিয়ে মানুষকে জল খাওয়ানো সম্পূর্ণ আন এথিক্যাল। এটা তো মানুষ মেরে ফেলার উপায়। যে সমস্ত অঞ্চলে মানুষ ল্যাবরেটরিতে আর্সেনিকযুক্ত জল পরীক্ষা করতে দিয়েছে তাদের জলে আর্সেনিকের পরিমাণ কত, সেই অঞ্চলের মানুষদের কি ধরনের অসুখ হয় এই সব ব্যাপারগুলোর ওপর সমীক্ষা ও পরীক্ষা হয়। প্রসঙ্গত আমরাই প্রথম এপিডেমোলজিক্যাল গবেষণা করেছি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সাত হাজারের বেশী মানুষের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছি।

● বি. ম. ঃ এটা কোন সময়কার কথা?

ডঃ গুহ মজুমদার ঃ ১৯৯৫ সাল।

● বি. ম. ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন্ কোন্ অঞ্চল জুড়ে চালিয়েছিলেন সমীক্ষাটি?

ডঃ গুহ মজুমদার ঃ ভাঙ্গড়, মন্দিরবাজার, বারুইপুর, জয়নগর ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

● বি. ম. ঃ হু-এর সহনমাত্রার নিরীখে বিচার করলে

তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা অনেক বেশী হবে। হু-এর নির্ধারিত মাত্রাই যদি সর্বোচ্চ লিমিট হয় তবে তো ভারতীয়দের আর্সেনোকোসিস হওয়াটাই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হবে।

ড: গুহ মজুমদার ঃ সেটা দেখার জন্যই তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আমরা সার্ভেটা চালিয়েছিলাম। আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে বলা যায়, কতগুলো ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে হু-এর লিমিট ঠিক করা হয়েছে। এটা বলতে পারেন হু-এর একটা অ্যাডভাইস মাত্র। ভারত তা নেয়নি। তেমনি বাংলাদেশ বা থাইল্যান্ডও তা নেয়নি।

● বি. ম. ঃ না নেওয়ার কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?

ড: গুহ মজুমদার ঃ কারণটা পরিষ্কারভাবে অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণেই হু নির্ধারিত লিমিটের জল অনেকে সাপ্লাই করতে পারবে না, তাই ...। আবার বৈজ্ঞানিকভাবেও এই তথ্যটা কতটা সঠিক সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। তাই এটাও একটা ফ্যাক্টর। ক্রমাগত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মানুষের শরীরে আর্সেনিকের প্রভাবে শুধুমাত্র চর্মরোগ হয় তা নয়, ক্যানসারও হয় – স্কীন ক্যানসার, ইউরিনারী ব্লাডার ক্যানসার এবং লাঙ্গস্ ক্যানসার এই তিন ধরনের ক্যানসারই দেখা যায়। যাই হোক, অর্থনৈতিক কারণটাই আসল। যে দেশে এত অপুষ্টি, এত অনাহার সেখানে তো ...

● বি. ম. ঃ পুষ্টি, ইমিউনিটি পাওয়ার ন্যাচারাল আর্সেনোকোসিস হওয়াকে কতখানি প্রতিরোধ করতে পারে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ পুষ্টির সঙ্গে আর্সেনোকোসিসের সম্পর্ক আমরা গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছি যে – অপুষ্টি যাদের মধ্যে আছে, একই জলে তাদের মধ্যে বেশী অসুস্থতা দেখা দেয় যাদের অপুষ্টি নেই তাদের তুলনায়। প্রোটিন ম্যাল নিউট্রিশন অর্থাৎ আমীষ জাতীয় খাদ্য যারা কম খায় তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী।

● বি. ম. ঃ ভারতবর্ষে আর্সেনোকোসিসের মাত্রা বাড়ার ক্ষেত্রে অপুষ্টিকে একটা কারণ হিসাবে দেখা যায় কি?

ড: গুহ মজুমদার ঃ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কেন, যেসব দেশে অপুষ্টিগত কারণ আছে সেই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে প্রযোজ্য।

● বি. ম. ঃ আপনি বলতে চান পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশগুলিতে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ হ্যাঁ। তবে অন্য একটা ফ্যাক্টরও আছে। আমেরিকান একটি গ্রুপের সাথে চিলিতে আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন গ্রামে সার্ভে করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে একটি বিশাল অঞ্চল জুড়ে মানুষ যে জল খায় তাতে আর্সেনিকের ঘনত্বের মাত্রা মারাত্মক বেশী। অগ্ন্যুৎপাতের পর যে লাভা বেরিয়েছিল সেখান দিয়ে যে ক্যানাল ওয়াটার আসে সেই জলই তারা খায়। তাই তাদের নিউট্রিশন বা পুষ্টি যথেষ্ট ভালো হলেও এবং তারা হাই প্রোটিন খেলেও তাদের মধ্যে আর্সেনোকোসিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রচুর। সুতরাং আর্সেনোকোসিসের মাত্রাবৃদ্ধি শুধুমাত্র অপুষ্টি নয়, জলে আর্সেনিকের ঘনত্বের ওপরও নির্ভর করে।

● বি. ম. ঃ আর্সেনিক তো খাদ্য-বাতাস-জল তিনভাবেই মানুষের শরীরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনটার মাত্রা কতটা?

ড: গুহ মজুমদার ঃ ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালে আর্সেনিকের লক্ষণগুলো চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছিল জলে আর্সেনিকের দূষণের মাধ্যমে।

● বি. ম. ঃ আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিতকরণ বলছেন?

ড: গুহ মজুমদার ঃ আর্সেনিকের জন্য যে চর্মরোগ হয়, সেটা ধরা পড়ল ১৯৮৩ সালে। কিছু মানুষের চর্মরোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা শুরু হল। শ্যালো টিউবওয়েল ৮০-১২০ ফুট গভীর হয় যা দ্বিতীয় অ্যাক্যুইফার পর্যন্ত যায়। যেহেতু পুকুরের জল জীবাণুযুক্ত তাই মানুষ শ্যালো টিউব ওয়েলের জল খেতে শুরু করল। তাই প্রচুর পরিমাণে শ্যালো টিউবওয়েল খোড়া হল।

● বি. ম. ঃ এই ৮-এর দশকে নলকূপ খননকার্যে সরকারের কি কোন নীতি ছিল?

ড: গুহ মজুমদার ঃ ৮-এর দশকে তো প্রথম রোগ ধরা পড়ল। তবে তার অনেক আগে থেকেই লোকে জল খেয়ে আসছে এবং অসুস্থও হয়েছে। তবে চিহ্নিতকরণ করা হয়নি। শুধু ওষুধ খাইয়ে তো অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য দরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল। এই সমস্যার একটাই সমাধান পাইপ ওয়াটার। পাইপ ওয়াটার দিয়ে শুদ্ধ পানীয় জল দিতে হবে। সরকার পাইপ ওয়াটার দিয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অ্যাক্যুইফার পর্যন্ত নলকূপ করে দিয়েছে। তাই প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য

যে প্রচেষ্টা নিয়েছে তা সঠিক প্রচেষ্টা।

● বি. ম. ঃ খাদ্য শষ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক কিভাবে মানুষের শরীরে আসে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ হ্যাঁ, সে বিষয়েই আসছি। আর্সেনিক যুক্ত জল মানুষ যে শুধু পান করছে তাই নয়, তা দিয়ে চাষবাসও হচ্ছে। তাই উৎপাদিত ফসলে কত পরিমাণ আর্সেনিক থাকছে এবং তা কতটা আমাদের ক্ষতি করছে তা নিয়ে গবেষণা শুরু হল ২০০১-২০০২ সাল থেকে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে দেখা যাচ্ছে ৪-এর বেশী আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। তা খেলেই কি আর্সেনোকোসিস হবে, এটা নিয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সঠিক গবেষণা হয়নি। খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে কত পরিমাণ আর্সেনিক ঢুকছে সে বিষয়ে গবেষণা ২০১২ সালে শেষ করি। খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে যত পরিমাণ আর্সেনিক ঢুকেছে তার তুলনায় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে বেশী ঢোকে।

● বি. ম. ঃ খাদ্য শষ্যের মধ্যকার আর্সেনিকের উৎসটিও কি সেই ভূগর্ভস্থ জল যে জল দিয়ে মূলত ঐ শষ্যগুলো উৎপাদন হচ্ছে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

● বি. ম. ঃ আর্সেনোকোসিস রোগটি তো বহুদিনের। মতান্তরে জানা যায় ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের মৃত্যু নাকি এই রোগের ফলেই হয়েছিল।

ড: গুহ মজুমদার ঃ বহুদিনের তো বটেই। আর্সেনিক তো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত। হাঁপানি রোগে ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন পেষ্টিসাইডে ব্যবহৃত হত। প্রথম আমরা জানতে পারি তাইওয়ান থেকে।

● বি. ম. ঃ এজেন্ট ব্লু নামক আর্সেনিক ঘটিত রাসায়নিক যৌগটিও তো একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক যৌগ। এর ব্যাপারে কিছু বলবেন?

ড: গুহ মজুমদার ঃ এজেন্ট ব্লু-র নাম শুনিনি।

● বি. ম. ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা এটি প্রয়োগ করেছিল ভিয়েতনামীদের উপর। এতে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল এবং বহু ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

ড: গুহ মজুমদার ঃ আমার এটা জানা নেই।

● বি. ম. ঃ আমরা জানি অর্গানিক এবং ইনর্গানিক এই দুইরকম ফর্মে আর্সেনিক যৌগরূপে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতামত ইনর্গানিক আর্সেনিক যৌগ বেশী ক্ষতি করে অর্গানিক যৌগের তুলনায়। এর কারণ কি?

ড: গুহ মজুমদার ঃ ঠিকই বলেছেন। সেটার কারণ হচ্ছে শরীরে অর্গানিক আর্সেনিকটা অ্যাবজর্বড হয়ে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ইনর্গানিক আর্সেনিকের সবটা ইউরিনের মাধ্যমে বেরোয় না। অজৈব আর্সেনিক যৌগ শরীরে জমতে থাকে যাকে জৈব সঞ্চয় বলে। সেই কারণে দীর্ঘদিন আর্সেনিক যুক্ত জল পান করলে শরীরে আর্সেনোকোসিস দেখা দেয়।

● বি. ম. ঃ আর্সেনিক কিভাবে আমাদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব সৃষ্টি করে তা যদি একটু বলেন।

ড: গুহ মজুমদার ঃ আর্সেনিক মূলত আমাদের শরীরের কোষে কোষে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরী করে। ফলে কোষে শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে বিভিন্ন অঙ্গ যেমন – পেশী, যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদির কর্মক্ষমতা কমে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অ্যাপপ্টোসিস (Apoptosis) বলে।

● বি. ম. ঃ প্রকৃতিতে কি এমন আর্সেনিক যৌগ পাওয়া গেছে যা জৈব যৌগ হিসাবে থাকে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ না পাওয়া যায়নি। আর্সেনিক প্রকৃতিতে মেটালয়েড হিসাবে থাকে। এলিমেন্ট বা মৌল আকারে আর্সেনিক নেচারে থাকে না।

● বি. ম. ঃ সি ফুডে তো অর্গানিক আর্সেনিকের পরিমাণ বেশী থাকে, আবার আপনি বললেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই আর্সেনিক গ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে অজৈব যৌগ হিসাবে। তাহলে কি এই অজৈব আর্সেনিক যৌগ থেকে জৈব আর্সেনিক যৌগের রূপান্তর সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরেই হয়?

ড: গুহ মজুমদার ঃ আর্সেনিক নেচারে আছে। সেখান থেকে কিভাবে জৈবযৌগ হিসাবে সি-ফুডে যাচ্ছে তা আমার জানা নেই। মোটামুটি যে সমস্ত শস্যে আর্সেনিক পাওয়া গেছে তারা ফুড চেনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। কোন কোন শস্যে আর্সেনিক অর্গানিক ফর্মে এবং কোন কোন শস্যে ইনর্গানিক ফর্মে আছে সেটা আমি বলতে পারবো। তবে সি-ফুডে কিভাবে জৈব আর্সেনিক এল সেটা আমার জানা নেই।

● বি. ম. ঃ এবার আসা যাক চিকিৎসা ও প্রতিরোধের বিষয়ে। যে কোনো অসুখের আমরা জানি দুধরনের ট্রিটমেন্ট হয় – প্রিভেন্টিভ ও কিওরেটিভ। আর্সেনোকোসিসের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকারের পদক্ষেপের ব্যাপারে একটু বলুন।

ড: গুহ মজুমদার ঃ প্রিভেন্টিভ পদক্ষেপ হচ্ছে বিশুদ্ধ

পানীয় জল এবং পুষ্টি। এর কোনো বিকল্প নেই। কিওরেটিভে পুনরায় বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টি এবং উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার। যারা আর্সেনিকযুক্ত অঞ্চলে বসবাস করছে এবং যাদের কোনো লক্ষণ নেই তাদের কাছে ভালো করে প্রচার করা দরকার। তাদের ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গায়ের বা চামড়ার কোনোরকম পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, তারা যে জল খাচ্ছে সেই জল পরীক্ষা করছে কিনা ইত্যাদি। বেশীরভাগ মানুষ না জেনে খেয়ে যায়।

● বি. ম. ঃ নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল খাওয়া বলছেন?

ড: গুহ মজুমদার ঃ হ্যাঁ, গ্রাউন্ড ওয়াটার খাচ্ছে। কয়েক লক্ষ টিউবওয়েল আছে, তার কোনটিতে আর্সেনিক আছে, কোনটিতে নেই সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার।

●বি. ম. ঃ সেই সব অঞ্চলে কর্পোরেশনের জল পৌঁছায়নি বলেই হয়ত মানুষ বাধ্য হয়ে টিউবওয়েলের জল পান করে।

ড: গুহ মজুমদার ঃ আমি গ্রামের কথা বলছি। শহর থেকে ২৫, ৫০, ১০০ মাইল দূরে এক একটি গ্রাম। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি কোথায় আর কর্পোরেশনই বা কোথায়! আপনাদের কি কোন আইডিয়া নেই গ্রাম সম্পর্কে?

● বি. ম. ঃ আর্সেনিক নিয়ে সরকারী বা বেসরকারীভাবে প্রথম কাজ পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে কবে কোথায় শুরু হল?

ড: গুহ মজুমদার ঃ পশ্চিমবঙ্গে কাজ শুরু হয়েছে ১৯৮৩ সালে। ড: কে সি সাহা প্রথম এর লক্ষণগুলো ধরেন। সাতের দশকে চন্ডীগড় থেকে আর্সেনিক থেকে চর্মরোগের মত একটি অসুখ হয়েছে বলে প্রকাশিত হয়। তখনই আমি আর্সেনিক নিয়ে কাজ শুরু করলাম। তবে প্রচার শুরু হয়েছিল ৮-এর দশকের শেষদিক থেকেই। প্রথমে ট্রপিক্যাল স্কুল, তারপর পিজি হসপিটাল, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট এই কটা ক্ষেত্রে আমরা কাজ শুরু করলাম।

● বি. ম. ঃ তার মানে আপনারা যে কাজ করেছেন এবিষয়ে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবেই?

ড: গুহ মজুমদার ঃ হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবেই।

● বি. ম. ঃ সরকারী লেভেলে কি কোন কাজই হয়নি?

ড: গুহ মজুমদার ঃ এই যে সরকারীভাবে জল দিচ্ছে এটা তো সরকারী স্তরেরই কাজ।

● বি. ম. ঃ আমাদের প্রশ্নটাও ঠিক এখানেই ছিল। আপনি বললেন নলকূপের যে প্রজেক্ট সেটা সরকারী উদ্যোগেই হয়েছিল। সরকার বলেছে পুকুরের জল খেয়োনা, নলকূপের জল খাও – মানুষ খেয়েছে। পরে আর্সেনিক সমস্যা ধরা পড়লে সরকার বলছে নলকূপের জল খেয়ো না। এক্ষেত্রে যদি জনগণের কাছে বিকল্প হিসাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল না সরবরাহ করা হয়, তবে বাধ্য হয়ে বেঁচে থাকতে নলকূপের আর্সেনিকযুক্ত জল পান করা কি সত্যিই জনগণের অসচেতনতাকে তুলে ধরে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ নিশ্চয়ই তুলে ধরে। মানুষের মধ্যে অসচেতনতা দূর করা সরকারেরই দায়িত্ব এটা যেমন ঠিক তেমনই জনগণের কাছে সঠিক জল পৌঁছে দেওয়া এটাও সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার কেন দিতে পারে নি সে বিষয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টরা তো বলছে। তারা তো বসে নেই।

● বি. ম. ঃ সরকার আমাদের দেশে এব্যাপারে কি কি প্রজেক্ট নিয়েছে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ প্রচুর প্রজেক্ট নিয়েছে। আমি সব প্রজেক্টের কথা বলতে পারব না। PHED রয়েছে। ইউনিসেফ এসেছে এখানে সাহায্য করতে। সুইড নামক একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে। সরকার যে জল দিচ্ছে, ১৫ বছর ধরে খেয়ে জনগণের কি পরিবর্তন হচ্ছে তা দেখা হচ্ছে।

● বি. ম. ঃ কিরকম পরিবর্তন হচ্ছে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ অনেক ইমপ্রুভ করছে।

● বি. ম. ঃ তাহলে তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে যেখানে সরকার সঠিক পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে সেখানে ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব। কিন্তু যেসব অঞ্চলে তা দিতে পারেনি সেখানে ব্যাক্তিগত সচেতনতা থাকলেও আর্সেনিক সমস্যা রয়েছে।

ড: গুহ মজুমদার ঃ ব্যক্তিগত সচেতনতাই প্রধান। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। তবে পরিকল্পনা ও প্রয়োজনানুসারে তার সঠিক বাস্তবায়ন -এর মধ্যে একটা ফারাক থেকে যাচ্ছে এটুকু বলতে পারি।

● বি. ম. ঃ ল্যাবরেটরিতে জল পরীক্ষার খরচ কত? এক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য আছে কি?

ড: গুহ মজুমদার ঃ ব্যক্তিগতভাবে করলে ৫০ টাকা। সরকারীভাবে করলে বিনাপয়সায় ইউনিসেফ PHED সাহায্যে দুতিনটি ব্লক অন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

● *শেষাংশ ৪২ পৃষ্ঠায়* ➔

সাক্ষাৎকার

এদেশে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা সম্পূর্ণ জিওজেনিক

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলদপ্তর (SWID) এর প্রাক্তন আধিকারিক ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রী শিবব্রত বসু রায় গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে পানীয় জলে আর্সেনিক সমস্যা এবং জলসংকট নিয়ে তাঁরসুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন যা আমাদের শিক্ষণীয় মনে হয়েছে। একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হল। – সম্পাদকমন্ডলী]

বি. ম. ঃ *আমরা 'বিজ্ঞান মনস্ক' থেকে এসেছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম সেমিনার করি। আপনার কাছে এসেছি – আর্সেনিক নিয়ে একটু ভালভাবে জানবার জন্য।*

বসু রায় ঃ আর্সেনিক ব্যাপারটা এখন অনেকটা থিতিয়ে গেছে। ৮০'র দশকে সেমিনার-টেমিনার প্রচুর হত। প্রচুর রকম এক্সিবিশন হয়েছে। এখন আর্সেনিক ব্যাপারটা মানুষ প্রথাগতভাবে মেনেই নিয়েছে – বলা যেতে পারে। আর্সেনিক আছে। গঙ্গার পূর্ব পাড়ে ইয়াংগার এ্যালুভিয়ামে – আর্সেনিক থাকবে। এর প্রতিকার কিছু নেই। বরং দিনের পর দিন বেড়ে যাবে। মানুষকে ঐ জলটা বাদ দিয়ে অন্য কোন জল খেতে হবে।

বি. ম. ঃ *অন্য জল বলতে ডিপ টিউবওয়েলের জল?*

বসু রায় ঃ না, না। PHED ডিপ টিউবওয়েল করেছিলো। ভাবা হয়েছিলো গভীরে করলে বুঝি আর্সেনিকটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু মোটামুটি একটাই অ্যাকুইফার রয়েছে, আর্সেনিকটা আলটিমেটলি তলার দিকটাতেও পাওয়া গেছিলো। অতএব টিউবওয়েল দিয়ে কিন্তু আর্সেনিক প্রতিরোধ করা যাবে না।

বি. ম. ঃ *কত গভীর পর্যন্ত আর্সেনিক পেয়েছেন আপনারা?*

বসু রায় ঃ আমি দীর্ঘ দিন মুর্শিদাবাদে ছিলাম। ম্যাক্সিমাম ৩০০-৪০০ ফুট পর্যন্ত একটা লেয়ার পাওয়া যেত। ৪০-৪৫ ফুট যেটা প্রথম অ্যাকুইফার; সেটাতে পাওয়া যেত না। তার পরেরটাতে পুরোটাতেই পাওয়া গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০০-৪০০-৫০০ ফুট গভীর একটা অ্যাকুইফার পাওয়া গেছে – যেখানে প্রথম দু এক বছর হয়ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি; পরবর্তীকালে সেগুলিতেও আর্সেনিক দেখা গেছে।

বি. ম. ঃ *কোন অঞ্চলটাকে আর্সেনিক দুস্থ বলা যেতে পারে?*

বসু রায় ঃ গঙ্গার পূর্বদিকে নতুন ব-দ্বীপে পুরোটাই আর্সেনিক রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিহার, ওয়েস্টবেঙ্গলের ডেলটার সবটাই। যেখানে স্যালিনিটি আছে সেখানে কিন্তু আর্সেনিকটা নেই। যেমন ঠাকুরপুকুরে। ৭০০-৮০০ ফুটে এখানে একটু মিষ্টি জল পাওয়া যায়। কিন্তু তার উপরের লেয়ারটা মোটামুটি লবনাক্ত। এই অঞ্চলে কিন্তু আর্সেনিক পাওয়া যায়নি।

> " ... গ্রামে গ্রামে কোনও মেয়ের বিয়ে হয় না। এবার গা স্পটে স্পটে ভর্তি। আমি আপনাদের ছবি দেখাতে পারি। সে ছবি দেখলে আপনারা চমকে যাবেন। পায়ের তলায় ব্লিস্টার ফর্ম করে গেছে; হাতে ... "

বি. ম. ঃ *এটা কি একমাত্র গ্রাউন্ড ওয়াটারেই পাওয়া যায়?*

বসু রায় ঃ হ্যাঁ, গ্রাউন্ড ওয়াটারেই। তবে জি এস আই-এর একজন বলেছেন – মালদা অঞ্চলের এক পুকুরে সারফেস ওয়াটারে নাকি আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আয়রনের সাথে আর্সেনিক খুব সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আয়রনকে প্রেসিপিটেট করিয়ে দেওয়া গেলে আর্সেনিকও প্রেসিপিটেট করে। তাই যত আর্সেনিকের প্ল্যান্ট আছে – আয়রনকে অক্সিডাইস্ড করে দিচ্ছে, আর্সেনিকও প্রেসিপিটেট করে গেছে। তাতে প্রায় ৯৯% আর্সেনিক রিমুভ্ড হয়ে গেছে।

তবে বিশেষ কারণে আর্সেনিক একটা রিডিউসিং এনভায়ার্নমেন্টে থাকতে পারে। যেখানে ওয়াটার লগ্ড

কন্ডিশন থাকবে, উপরে কভার দিয়ে ঢাকা থাকবে, সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারবে না। ধরুন সারফেস ওয়াটার কোন বদ্ধ জলাশয়ে কচুরিপানা দিয়ে ঢাকা রয়েছে – সেখানে হয়ত গভীরে আর্সেনিক পাওয়া যায়। কিন্তু সারফেস ওয়াটারে আর্সেনিক এখন পর্যন্ত রিপোর্টেড নয়।

বি. ম. ঃ *গ্রাউন্ড ওয়াটারে আর্সেনিক থাকার কারণ কি?*

বসু রায় ঃ অ্যাকুইফার বলে একটা জিনিস আছে। অ্যাকুইফার হচ্ছে মাটির তলায় আমরা যেখানে জল পাই। বৃষ্টি বা অন্য কোন জল চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচের দিকে যায়। এবং একটা সময় কালো মাটির স্তরে আটকে যায়। কাদার স্তর ভেদ করে আর এই জলটা যেতে পারে না। কিন্তু যদি কোন বালির স্তর, মোটা বালির স্তর যার দানার আকার একটু বড়, তাদের মাঝখানের শূন্যস্থান থাকে কিংবা পাথরের মাঝে ফাটল থাকে, তবে তার খাঁজে খাঁজে জল জমে থাকে। যেহেতু মাটির তলায় পাওয়া যায় তাই আমরা একে গ্রাউন্ড ওয়াটার বলি। এই যে স্তরটাতে জল সীমাবদ্ধ থাকে তাকে আমরা বলি অ্যাকুইফার বা ভাল বাংলাতে বললে "ভূসলিলাধার"। আর্সেনিক যৌগগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় মাটির তলায় গ্রাউন্ড ওয়াটারে পাওয়া যায়।

বি. ম. ঃ *এছাড়া আর্সেনিকের অন্য কি উৎস হতে পারে?*

বসু রায় ঃ আর্সেনিকের উৎসগুলোকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি অ্যানথ্রোপজেনিক অর্থাৎ মানুষের অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। আর একটা হল জিওজেনিক অর্থাৎ জিওলজিকাল কারণের জন্য। যেখানে মানুষ কয়লা জ্বালিয়েছে; জাহাজ ডক্ এরিয়াতে, বিভিন্ন জায়গায় স্ল্যাগ তৈরী হয় – এসব জায়গায় আর্সেনিক বায়ুতে পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির অ্যাক্টিভিটি যেখানে বেশি, সেখানেও প্রাকৃতিক ভাবে জলে আর্সেনিক মেলে যেমন চিলি।

দ্বিতীয় কারণ যেটা – সেটা, জিওজেনিক। জিওলজিকাল কারণের জন্য আর্সেনিক ভূগর্ভে একটা জায়গায় জমা হচ্ছে। আগ্নেয়গিরিজনিত বিষয়টাও তাই।

বি. ম. ঃ *আমাদের যে আর্সেনিকের সমস্যা সেটা অ্যানথ্রোপজেনিক না জিওজেনিক?*

বসু রায় ঃ **সম্পূর্ণ জিওজেনিক।** প্রথমে আমাদের মনে হয়েছিলো অ্যানথ্রোপজেনিক। আমরা মুর্শিদাবাদে জলের স্যাম্পেল নিয়ে কাজ করছিলাম। এক জায়গায় আর্সেনিকের মাত্রাগুলো বেশি পাই। আমরা ভেবেছিলাম ওখানে হয়তো কোন ডাম্প ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানে আমেরিকান সোলজাররা ক্যাম্পে পেস্টিসাইড বা মস্কিউটো রিপ্ল্যান্ট ব্যবহার করত। আর্সেনিক তো বহু জিনিসে ব্যবহার হয় – এমন কি পেষ্টিসাইড আগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হত। ওখানে হয়তো ওদের কোন ডাম্পে গিয়ে মিশেছে। প্রথমে মনে হয়েছিলো – পাইপটা থেকেই বুঝি আর্সেনিক আসছে। কেমিক্যাল – মেটালার্জিক্যাল টেস্ট হল। বিদেশেও পাঠানো হয়েছিলো। পাইপে কিছু পাওয়া যায়নি। প্লাষ্টিকের পাইপের টিউবওয়েলের জলেও কিন্তু আমরা আর্সেনিক পেয়েছি।

আমাদের গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, এবং বাংলাদেশে, অসমে, উত্তর প্রদেশের প্রচুর জায়গায় ক্রমাগত নজরে এসেছে। এগুলো পুরোপুরি জিওলজিকাল কারণের জন্যই। অর্থাৎ মূলতঃ হিমালয় থেকে নদীবাহিত যে পলিমাটিটা আসছে তার মধ্যেই আর্সেনিক রয়েছে।

বি. ম. ঃ *মাত্র কয়েক দশক আগেও তো আর্সেনিক বিষয়টা প্রাসঙ্গিক ছিলো না ...*

বসু রায় ঃ আগেও গ্রাউন্ড ওয়াটারে আর্সেনিক ছিলো। টিউবওয়েল ছিলো না। গ্রাউন্ড ওয়াটার উঠত না। মানুষ গ্রাউন্ড ওয়াটার খেতো না বলে, আর্সেনিক বিষয়টা প্রাসঙ্গিক ছিলো না।

আর একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সব জায়গাগুলোতে ইনসেনটিভ এগ্রিকালচার, খুব বেশি করে গ্রাউন্ড ওয়াটার তোলা হয়, যেমন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর চব্বিশ পরগণা – এসব জায়গাগুলোতে আর্সেনিকটাও বেশি।

বি. ম. ঃ *আপনি চাষাবাদের জন্য যে জল তোলা হয় তার কথা বলছেন? শ্যালো টিউবওয়েল ব্যবহারের জন্য কি ওসব অঞ্চলে আর্সেনিক বেশি?*

বসু রায় ঃ না।

বি. ম. ঃ *বর্ধমান বা হুগলীতে তো শ্যালোর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী ...*

বসু রায় ঃ এইটা নিয়ে নানান রকম থিয়োরি প্রচলিত ছিলো। কেউ বলছে ওয়াটার লগিং। আমি প্রথম ভেবেছিলাম রিডিউসিং এনভায়ার্নমেন্টে ...। ওখানে জল দিয়ে কি করা হয়? পাট পচানো হয়, জল ধরে রাখা হয়, সুতরাং এখানে হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে এগুলো কিন্তু কারণ না।

শ্যালো দিয়ে চাষের জন্য আর্সেনিক বাড়ে বলে যে কথাটা থামরুল হিসেবে ব্যবহার করা হত তার সত্যতা কিন্তু পাওয়া

যায়নি। পরবর্তীকালে এটা কিন্তু একটা মিথ।

আমি সেটা বললাম ভূগর্ভস্থ জল মানুষ খেয়েছে বলে হচ্ছে। আগে সারফেস ওয়াটার খেত, তখন হত না।

বি. ম. ঃ *তারপর যখন টিউবওয়েল হল?*

বসু রায় ঃ সত্তর দশকে শ্যালো টিউবওয়েলের ব্যাপ্তি হল। পশ্চিমবঙ্গে তার আগে পর্যন্ত শ্যালো টিউবওয়েলের ব্যাপারটা ছিলো না। তখন পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লব চলছে আর কি। মানুষ যে পাম্প করে জল তুলে চাষ করতে পারে, তা আগে পর্যন্ত জানত না। তার আগে পাঞ্জাবে গ্রীণ রেভুলেশন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও তার অনুকরণে শুরু হয়ে গেল গ্রীণ রেভুলেশন। এটা কিন্তু ১০-১২ বছর চলেছে। তারপরেই দেখবেন, মেনিফেসটেশন শুরু হয়ে গেছে।

বি. ম. ঃ *একটা লোক কত বছর আর্সেনিক যুক্ত জল খেলে মেনিফেস্টেশন শুরু হয়?*

বসু রায় ঃ আমি তো দেখেছি ৭-৮ বছরের বাচ্চাদের হয়নি। কিন্তু ১২-১৪ বছর বাচ্চাদের শুরু হয়ে গেছে। দুটি জিনিস খুব পরিষ্কার জেনে রাখবেন –

১) প্রথম হচ্ছে – এটা একদম জল বাহিত। জলের উৎসটা সরালে আর্সেনিক চলে যাবে।

২) দ্বিতীয় হচ্ছে – পুষ্টির সঙ্গে প্রচন্ড সম্পর্ক আছে। মানে যারা খেতে পায় না; যাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা একটু উইক, লো প্রোটিন, ম্যাল নিউট্রিশন আছে – তাদের কিন্তু এটা আরও বেশি করে হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। **যেখানে যেখানে গরিব অঞ্চল, সেখানে সেখানে ক্যালোরি ইনটেক কম রয়েছে; সেখানে কিন্তু ম্যানিফেসটেশনটা বেশি দেখেছি।**

বি. ম. ঃ *আর্সেনিকের কিরূপ ভয়াবহতা দেখেছেন?*

বসু রায় ঃ মুর্শিদাবাদে দেখেছি –**গ্রামে গ্রামে কোন মেয়ের বিয়ে হয় না। সবার গা স্পটে স্পটে ভর্তি। আমি আপনাদের ছবি দেখাতে পারি। সে ছবি দেখলে আপনারা চমকে যাবেন। পায়ের তলায় ব্লিস্টার ফর্ম করে গেছে,** হাতে এবং পায়ে একটু বড়দের ধরুন ২০-২৪ বছর বয়স্কদের।

আপনারা জানেন – গাইঘাটা বলে উত্তর চব্বিশ পরগণায় একটা জায়গা আছে? গাইঘাটা হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখানে নলকূপে প্রথম আর্সেনিক ব্যাপারটা ধরা পড়েছিলো। খুব সম্ভব '৮০-'৮১ সালে। **গাইঘাটা এক ভয়ঙ্কর আর্সেনিকের অঞ্চল।**

বি. ম. ঃ *জলে আর্সেনিকের পারমিসিব্‌ল লিমিট কত?*

বসু রায় ঃ হু-এর স্ট্যানডার্ড হল ০.০১ পি পি এম। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘদিন ধরে ০.০৫ পি পি এম বলে চালিয়ে যাচ্ছে।

বি. ম. ঃ *কিন্তু ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড কোনটা?*

বসু রায় ঃ ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড আর হু-এর স্ট্যানডার্ড বলে তো কোন লাভ নেই। **ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড হওয়া উচিত ০.০০১ পি পি এম। কারণ বিদেশে ওদের হাই প্রোটিন ইনটেক করে যদি ০.০১ পি পি এম হয়, ইন্ডিয়াতে তো অনেক কম হওয়া উচিত।** আপনাদের একটা তথ্য দিই। আর্সেনিক টাস্ক ফোর্স বলছে – এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩১৪টি ব্লকের মধ্যে ৮১টি ব্লকে বেশ ভালোরকম আর্সেনিকের অস্তিত্ব আছে এবং এখানে পারমিসিব্‌ল লিমিটের থেকে বেশি আছে।

বি. ম. ঃ *পারমিসিবল লিমিট বলতে কি হু-এর ০.০১ পি পি এম?*

বসু রায় ঃ শুনুন, এখানে যদি ০.০৫ও করে,তাতেও তেমন হেরফের হবে না। অনেক জায়গায়ই এখানে ০.০৫কে ব্রেক করে গেছে। অতএব এই ব্যারিয়ারটা দিয়ে ব্লকের সংখ্যা কমানো যাবে না।

বি. ম. ঃ *কলকাতার অবস্থা কেমন?*

বসু রায় ঃ আমাদের কলকাতার কয়েকটা জায়গায় পারমিসিব্‌ল লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। ব্রহ্মপুর, বাঁশদ্রোণী, নাকতলা, গড়িয়া অর্থাৎ আদিগঙ্গার পাশ ধরে ওর যে ন্যাচারাল লেভিটা (নদীখাতের দুই পাড়) ছিলো, সেটা ধরে ধরে আমরা দেখেছি – আর্সেনিক আছে। এটা আমাদের কনক্লুশন। এমন কি আনোয়ার শাহ রোডেও দু'একটা কেসে আছে। এটা বিতর্কিত। ওরা কিন্তু স্বীকার করবে না। আমাদের কর্পোরেশনের সাথে এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন যুদ্ধ চলছে। আপনারা বলতে পারেন আদিগঙ্গার পাশে অববাহিকায় পাওয়া গেছে।

বি. ম. ঃ *আর্সেনিকের উৎস হচ্ছে হিমালয়। তাহলে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে আর্সেনিক পাওয়া যায় না কেন?*

বসু রায় ঃ খুব ভাল একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি। হিমালয়ের যে একেবারে ইমেডিয়েট জায়গাটা – সেডিমেন্টগুলো নেমে আসছে বড় বড় বোল্ডার ফর্মে। আর্সেনোপাইরাইট তার ভিতরে রয়েছে। এখনো হয়তো আর্সেনোপাইরাইট বা আর্সেনিক ভেঙে বেরোতে পারে নি।

ধরুন সেডিমেন্ট যখন একটা জায়গা থেকে ক্ষইতে শুরু করে – বড় বড় বোল্ডারগুলো প্রথমে টুকরো হয়। আস্তে-

আস্তে গড়িয়ে নিচে নামে। খাড়া ঢালে সেট্‌ল হতে পারে না। ভেঙ্গে টুকরো হয় – জল গড়িয়ে নিচে নামে। আরও ঘষা লেগে গুঁড়ো হয়। যত হাল্কা হবে জল তত সহজে গড়িয়ে নিয়ে যাবে। অবশেষে ব-দ্বীপে সেডিমেন্ট সেট্‌ল হয়। তাই কোথাও পাহাড়ে আর্সেনিক পাওয়া যায় না।

তবে পাহাড়ের ঝর্নাতে কিন্তু পাওয়া যায়। এটা পৃথিবীতে সমস্ত জায়গায় – যেখানে আর্সেনিক 'র' ফর্মে আর্সেনোপাইরাইট আছে – সেখানে কিন্তু ঝর্ণার জলে আর্সেনিক পাওয়া যায়। আমরা ছোট সময়ে একটা বই পড়েছিলাম – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র 'চাঁদের পাহাড়'। চাঁদের পাহাড়ে আছে যে – একটা জায়গায় জল খেয়ে প্রচন্ড পেট যন্ত্রণা করছিলো। বোধহয় উল্লেখও আছে যে – আর্সেনিক আছে। মনে আছে?

বি. ম. ঃ *হ্যাঁ। শংকর গিয়ে ঐ গুহার ভিতর যখন জলটা খেলো পেটে যন্ত্রণা করছিলো।*

বসু রায় ঃ তো ঝর্ণার জলে আর্সেনিক আছে। যেহেতু আর্সেনোপাইরাইটের লেয়ারটা কেটেই ঝর্নাটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঝর্ণার জলটা যত দূরে যেতে থাকে কনসেনট্রেশন অনেক কমে যাবে। তরাই অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট নেই। সমভূমিতে আছে।

বি. ম. ঃ *কিষাণগঞ্জে নাকি রিপোর্টেড হয়েছে?*

বসু রায় ঃ বিহারের কিষাণগঞ্জে গেলে যতগুলো ইয়াংগার রিভার আছে তার কোর্সে আপনি আর্সেনিক পাবেন। যেমন ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে মুর্শিদাবাদে কাঁদি বলে একটা ব্লকের কয়েকটি জায়গায় আর্সেনিক আছে। অর্থাৎ যে সেডিমেন্টগুলো আসছে সেই সেডিমেন্টগুলোর ভিতর আর্সেনিক আছে।

বি. ম. ঃ *আর্সেনিককে কিভাবে জল থেকে মুক্ত করা যায়?*

বসু রায় ঃ বিভিন্ন রকম ফিলটার তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় কিছু কিছু খাবার জলের টিউবওয়েলে ফিল্টার লাগানো হয়েছিলো। কিন্তু সে ফিল্টারগুলো একটা সময় পরে অকেজো হয়ে যায় এবং সেগুলোকে রিপ্লেস করতে হয়। তার জন্য কিছু কিছু দপ্তর অ্যানালাইসিস করত এবং "আর্সেনিক নেই" – এই সার্টিফিকেট দিলে পঞ্চায়েত টাকা দিতো। এবং আবার নতুন ফিল্টার লাগিয়ে দিয়ে যেতো। আলটিমেটলি এই প্রসেসটা খুব কার্যকরী হয়নি।

জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ (PHED) কিছু কিছু জায়গায় গভীর টিউবওয়েল করেছে। আর গঙ্গার জল পরিশোধন করে ব্যবহারযোগ্য করেছে। সারফেস ওয়াটারে তো আর আর্সেনিক থাকে না। এরকম প্রকল্প ওরা নিয়েছে অনেক জায়গায়। ৭ দিন ১০ দিন পর পর দেখবেন অমুক প্রকল্পের উদ্বোধন, তমুক প্রকল্পের উদ্বোধন। কাগজে ছবিও বের হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভালরকম একটা ফান্ড পায়। কয়েক হাজার কোটি টাকার মত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দেয়।

বি. ম. ঃ *PHED নির্মিত টিউবওয়েলগুলো কি আর্সেনিকমুক্ত জল দিতে পারছে?*

বসু রায় ঃ নীতিগতভাবে যেটা করা দরকার, – দুটো অ্যাকুইফারের মাঝখানে যদি একটা অপরিবাহী (সাধারণত ক্লে) লেয়ার থাকে – সেখান থেকে আর্সেনিকটা চুঁইয়ে পরের অ্যাকুইফারে যেতে পারে না। সেই পরের অ্যাকুইফারে গিয়ে যদি পৌঁছাতে পারি তাহলে হয়ত আর্সেনিক থাকবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু এই অঞ্চলটাতে মূলতঃ মনো-অ্যাকুইফার মানে একটাই অ্যাকুইফার এবং যদিও কোথাও দুটো অ্যাকুইফার পাওয়া যায়, তারা ব্রীজের মত কানেক্টেড থাকে। অতএব এটা খুব একটা কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। তাই কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে – প্রথম বছর আর্সেনিকের মাত্রা ০.০০২ পি পি এম ছিলো, পরবর্তী কালে সেটা বাড়তে বাড়তে ০.০৩ পি পি এম পরে ০.০৫ পি পি এম-এ পৌঁছে গেছে। এটা হয়ত বিতর্কিত। ওরা স্বীকার করবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি এটা হয়।

> "গাইঘাটাতে তো ২ পি পি এম'ও পাওয়া গেছে। যেন আর্সেনিক গুলে জল খাচ্ছে তারা।"

বি. ম. ঃ *এভাবে ক্রমান্বয়ে আর্সেনিক বাড়তে থাকার কারণ কি?*

বসু রায় ঃ বিজ্ঞান বলছে যেহেতু লেয়ারগুলো আলাদা নয়, অতএব আর্সেনিক সঞ্চয় হতে বাধ্য। আপনি এতোদিন ট্যাপ করেন নি, সেখান থেকে জল আনেননি; তাই কম ছিলো। যে মুহূর্তে জল তুলবেন কানেক্টেড হয়ে যাবে, চ্যানেলটা তৈরী হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আর্সেনিক জমা হয়ে যাবে। সেজন্য যেখানে আর্সেনিক রয়েছে, সেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ নো সলিউশন।

বি. ম. ঃ *কোন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন এ বিষয়ে কোনও প্রকল্প নিয়েছে?*

বসু রায় ঃ ডিপ্ বা শ্যালো টিউবওয়েল – ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্প ছাড়া বেসরকারীভাবে কেউ কিছু করতে পারে না।

বি. ম. ঃ *তাহলে সরকার যে অনেকসময় কাজগুলো প্রাইভেট কনসার্নের মাধ্যমে করাচ্ছে?*

বসু রায় ঃ সরকার অর্থাৎ PHED। ওরা কিছু এনজিও-কে কিট্ দিয়ে দিয়েছে, আর্সেনিক ডিটেকশন কিট্। এটা মূলতঃ করছে –সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, যেমন 'ব্রেক থ্রু' আর আছে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'। কিছু কিছু জায়গায় ওদের প্রচুর ছেলে আছে – টাকা দিয়ে দিচ্ছে, কিট্ দিয়ে দিচ্ছে – প্রতি স্যাম্পেল অ্যানালাইসিসে ওরা হয়ত ৫০ টাকা করে পাচ্ছে। ওদের দিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার স্যাম্পেল অ্যানালাইসিস করাচ্ছে।

বি. ম. ঃ *এই যে টিউবওয়েলের সঙ্গে যুক্ত ফিলটারের মাধ্যমে যে আর্সেনিককে আলাদা করা হয় – এই থক্‌থকে বিষাক্ত আর্সেনিক পদার্থকে কি করা যায়?*

বসু রায় ঃ এটাকে ডিসপোজাল করা হয়। তবে ডিসপোজালটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর। একটা টিউবওয়েল তো কয়েক হাজার টন স্ল্যাগ তৈরি করে দেয়। অনেক প্ল্যান হয়েছিলো যে ওটাকে সিমেন্টে মিশিয়ে বিল্ডিং মেটেরিয়াল তৈরি করবে, রাস্তা বানাবে, সমুদ্রের তীরে বাঁধ দেবে। অমুক করবে, তমুক করবে। আমি জানি না কি করা হয়েছিলো।

বি. ম. ঃ *এটা কি বার্ন করা যায় – সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে?*

বসু রায় ঃ এটা তো কাদাটে ধরনের কিভাবে বার্ন করাব? তাহলে তো প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড লাগবে।

বি. ম. ঃ *এখন ঠিক কিভাবে আর্সেনিক রিমুভাল হচ্ছে?*

বসু রায় ঃ আমি বলব, আপনারা (PHED) -র সাথে কথা বলে নিন। সল্টলেকে ওদের অফিস আছে। বিকাশভবনে।

বি. ম. ঃ *আপনার জানা মতে?*

বসু রায় ঃ একটা পদ্ধতি আছে – রিভার্স অস্‌মোসিস্। এক্ষেত্রে আয়ন অক্সিডাইসড্ করা হয়। কোন স্ল্যাগ জেনারেশন হয় না। টেকনোলজিটা পাল্টে গেছে।

একসময় কোনও এক জার্মান কম্পানি একটা টেকনলজি দিয়েছিলো। এটা ছোট আকারের। ড্রিংকিং ওয়াটারের জন্য প্রযোজ্য। সেটা মেইনলি হচ্ছে একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে আর্সেনিককে অক্সিডাইজ্‌ড করে দেওয়া হত। সেটাতে যে অধঃক্ষেপ পড়ত সেটাকে আলাদা করে নেওয়া হত। সেটা কিন্তু টক্সিক নয়। কিন্তু আগে যেটা করত সেটা টক্সিক ছিলো।

বি. ম. ঃ *নন টক্সিক আর্সেনেট যৌগ থেকে আর্সেনিক কি আবার মুক্ত হতে পারে না?*

বসু রায় ঃ ওটা হবে না। ওটা হতে হলে আপনাকে বহুবছর ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে রেখে (হাইড্রোলোসি প্রক্রিয়া) আবার আর্সেনাইট করতে হবে। তবে কনসেনট্রেশন হাই থাকে তো এক্ষেত্রেও প্রতিরোধী ব্যবস্থা অর্থাৎ সেফ ডিসপোজালের কথাটা ভাবা উচিত।

বি. ম. ঃ *আপনার মতে সেফ ডিসপোজাল কিভাবে হওয়া উচিত?*

বসু রায় ঃ বাংলাদেশে নাকি বড় বড় ড্রামে ভরে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়। পরে ঐ ড্রাম লিক করতে পারে। সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের এনভায়ার্নমেন্টে আর্সেনিক আর টক্সিক থাকবে না। তবে বিশাল খরচার ব্যাপার। তাছাড়া তাতে তো বিভিন্ন গ্রীন পিস্ গ্রুপগুলি (সমুদ্র দূষণ বিরোধী) এলাউ করবে না। কিভাবে ডিসপোজাল করবে জানি না।

বি. ম. ঃ *আপনি বলেছেন অনেক জায়গায়ই টিউবওয়েলে ফিল্টার বসানো হয়েছে। তাহলে কি সেই অঞ্চলগুলো এখন আর্সেনিক মুক্ত বলা যেতে পারে?*

বসু রায় ঃ আর্সেনিক মুক্ত নয়। মাটির তলায় ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক রয়েছে। কিন্তু মানুষ এখন আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়ার অধিকারী হয়েছে। অর্থাৎ তারা এখন পেতে পারে।

বি. ম. ঃ *তাহলে আর্সেনিক তো আর কোনও সমস্যাই নয়?*

বসু রায় ঃ এখানে বলি – একটা মৌজায় ৭-৮ বর্গ কিলোমিটারে একটা ট্যাপ ওয়াটার পয়েন্ট। সবগুলো আবার হ্যাবিটেশনের গা ধরে যায়নি। বাড়িতে বাড়িতে পাইপলাইন দিয়ে তো আর জল সাপ্লাই করা সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের কলকাতা শহরেও সম্ভব হয়নি। একটা লোক দেখছে ওই জল আমার বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে। ভাবছে – ধোর কিছু হবে না, পাশের টিউবওয়েলের জলটাই খাই। লাল রং করে দেওয়া হয়েছে টিউবওয়েলগুলোতে। **মানুষ এতো দরিদ্র, ব্যাপারটা বোঝেও না অনেকে।**

বি. ম. ঃ *কলকাতায় আর্সেনিকমুক্ত জল কি চালু হয়েছে?*

বসু রায় ঃ আপনি কি জানেন – টালিগঞ্জ-ঠাকুরপুকুর

মহাত্মা গান্ধী রোডের ঐ পাশটাতে, ক্যান্সার হসপিটালটার ওপারটাতে একটা মোটা পাইপ চলে গেছে? গঙ্গার জল বাখরার দিকে একটা জায়গা থেকে পাম্প করে দিচ্ছে। কিছু কিছু রোড এলাকাতে একটা করে পয়েন্ট দিচ্ছে – বিনা পয়সায়। বাড়িতে যাদের দিচ্ছে তাদের মিনিমাম মাসে ১৫ টাকা দিতে হয়। আমরা হাউজিং-এ একটা কানেক্শ্ন নিয়েছি। সেখানে মাসে ১৫০০-২০০০ টাকা দিতে হয়। আপনি যদি ঐ আর্সেনিক মুক্ত জলটা পেতে চান আপনাকে অনেক টাকা দিতে হবে।

বি. ম. ঃ *একটা কানেক্শনে কি হাউসিং-এর সবার প্রয়োজন মেটে?*

বসু রায় ঃ না, না। কি করে হবে? এখানে প্রায় তিন হাজার লোক থাকে। জল পাবেন একটা পয়েন্টে সকাল ৮টা থেকে ১০টা, দুপুর ১২টা থেকে ১টা, আর বিকেল ৫টা থেকে ৬টা। একটা জায়গায় মারামারি করার তো মানে হয় না। আমরা ডিপ টিউবওয়েলের জল – যেটা ট্যাঙ্কে আসে – সেটা ফিল্টার করে খাই। কলকাতায় তো আর্সেনিকের বিশেষ প্রবলেম নেই। কিন্তু আমি যে ঐ গ্রামগুলোর কথা বললাম, ওখানে তো আর্সেনিক আছে।

বি. ম. ঃ *প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই তো আপনারা কানেকশনটা নিয়েছেন। অথচ সম্ভব হচ্ছে না একটা পয়েন্ট থেকে এতোজনের চাহিদা মেটানো। এবং খরচা সাপেক্ষও। আর যারা গ্রামে থাকে – পয়েন্টগুলো সেখানে কি বাড়ানো উচিত নয়?*

বসু রায় ঃ আমি যেহেতু সরকারী অ্যাডমিনিসট্রেশনের একটা পার্ট ছিলাম, অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি সরকার একজায়গায় পাইপ লাইন নিয়ে যায় নেটওয়ার্ক তৈরী করে। আপনি আউটলেটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন, তাতে আর জলের ফোর্স থাকবে না। গ্রামের অনেক লোক যারা পয়সা দিয়ে নিজের বাড়িতে পাইপলাইন নিতে পারে – সরকার কি তাদেরকেও দিতে পারবে?

কিন্তু আগে একটা গ্রামে আর্সেনিক মুক্ত জল বলে কিছু ছিলো না। এখন সরকার কিছুটা দিয়েছে। ডেফিনেটলি এটা সাফিসিয়েন্ট নয়। আরও বাড়ানো দরকার।

কিন্তু এটাও তো দেখা গেছে যে স্টপারগুলো চুরি হয়ে গেছে। দিনের পর দিন জল পড়েই যাচ্ছে একনাগারে। আর্সেনিক নিয়ে আসলে চেতনার অভাবটা রয়েই গেছে। এক একটা গ্রামে ঘরে ঘরে ক্যান্সার পেসেন্ট এবং প্রচুর লোক মারা গেছে। আমার নিজের চোখে দেখা।

বি. ম. ঃ *ডেথ রেকর্ড কিরকম আছে?*

বসু রায় ঃ গাইঘাটা এলাকায় খুব মারাত্মক রকমের। প্রতি ঘরে ঘরে। সারা নর্থ চব্বিশ পরগণাতে ভয়ঙ্কর রকমের। অন্য জায়গায়ও আর্সেনিকের ম্যানিফেসটেশন ০.৭ পি পি এম, ০.৮ পি পি এম দেখেছি। ০.৮ মানে ৮০ গুণ বেশি। গাইঘাটাতে তো **২ পি পি এম'ও পাওয়া গেছে। যেন আর্সেনিক গুলে জলটা খাচ্ছে তারা।**

বি. ম. ঃ *ন্যাচারাল ডেথের ক্ষেত্রে গভ্মেন্ট তো ক্ষতিপূরণের একটা নিয়ম করেছে। বাজ্ পড়ে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দেয়। এটাকেও তো একটা ন্যাচারাল ডেথ বলা উচিত!*

বসু রায় ঃ ক্ষতিপূরণ কি দেয় সরকার? আমি জানি না। তবে কতগুলো আর্সেনিক ক্লিনিক খোলা হয়েছে। যেমন পিজি'তে একটা খোলা হয়েছিলো। জেলা সদরে একটা করে হাসপাতালের সঙ্গে একটা করে আর্সেনিক ক্লিনিক খোলার কথা – বিশেষ করে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাগুলোতে। আইডেনটিফিকেশনের জন্য অন্তত ডাক্তার থাকার বন্দোবস্ত – তখন রেকমেন্ড করা হয়েছে। এবং আমি যতটা জানি পিজি'তে ক্লিনিকটা এখনও পর্যন্ত আছে।

বি. ম. ঃ *আর্সেনিক সমস্যাটা বললেন জলবাহিত। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় গোটা ভারতবর্ষেই ৭০%-এর বেশি রোগের কারণ অবিশুদ্ধ জল। তাহলে সরকারকে এ ব্যাপারে একটা দারুণ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়?*

বসু রায় ঃ এটা সরকারের বলা উচিত। আমি কি বলব? ভারতবর্ষ এখন ওয়াটার স্ট্রেচ কান্ট্রি হয়ে গেছে। আরবানাইজেশন বাড়ছে, ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে। জলের উপর চাপও অনেক বেশি বাড়ছে। জল কিন্তু জলের মত সহজলভ্য ব্যাপারটা থাকবে না। জল একটা দামী কমোডিটি হয়ে যাবে। ভূগর্ভস্ত জলের বেশির ভাগটাই এখন কনটামিনেটেড্ ওয়াটার হয়ে গেছে।

বি. ম. ঃ *এর কারণ কি?*

বসু রায় ঃ কারণ, একটা আর্সেনিক বললাম। আর একটা ফ্লোরাইড; যেটা পশ্চিমবঙ্গে অতটা দেখতে পাননি। তাও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রচুর জায়গায় ফ্লোরাইডের একটা ব্যাপক প্রভাব আছে। এই ফ্লোরাইড কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট সবজায়গায়; ভয়ঙ্কর রকমের। ফ্লোরোসিসটা সারা ভারতবর্ষে একটা বিশাল সমস্যা।

স্কেলিটাল ফ্লোরোসিসে মেরুদন্ড বেঁকে যাচ্ছে। পা বেঁকে যাচ্ছে – হাঁটতে পারছে না। একটা ২০ বছরের ছেলেকে মনে হচ্ছে ৫০ বছরের বয়স্ক লোক।

এছাড়াও রয়েছে লেড পয়জনিং, মার্কারী পয়জনিং – মারাত্মক সব পয়জনিং। গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে এগুলো আসে।

ধরুন কোন ফ্যাক্টরী কতগুলো অ্যালয় তৈরি করছে। জলটাকে ঠিক ট্রিটমেন্ট করছে না, তা মাটির তলায় চলে যাচ্ছে। পুরুলিয়াতে এরকম একটা জায়গায় মারাত্মক ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছিলো। ফ্যাক্টরিটা তারপর বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে **লোকের চাপে। সরকার কিন্তু কিছু করেনি।**

বি. ম. ঃ *সারফেস ওয়াটার মোটামুটি কি সাফিসিয়েন্ট বলা যায়?*

বসু রায় ঃ সারফেস ওয়াটার তো আরও বেশি দুঃষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। কারণ, যে সব নদীগুলো থেকে জল পেতাম – সবই সিজনাল নদী হয়ে গেছে; পেরিনাল নদীর ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে গেছে। নদীর কোর্স পাল্টে যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে রিভার বেল্টে যেসব জায়গায় ফিডার বসিয়েছিলো – সেখানেও নদীর কোর্স পাল্টে গেছে। সরকারের যে "রিভার লিফ্ট ইরিগেশন" প্রকল্পগুলো ছিলো, বেকার হয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দেখে আপনি বুঝবেন না। সারা ভারতবর্ষের অবস্থা কিন্তু ভয়াবহ। **ভারতবর্ষে জলের সংকট আগামী দশকেই** দেখা দেবে।

বি. ম. ঃ *জলের এই সংকট সম্পর্কে সরকার কি ওয়াকিবহাল নয়?*

বসু রায় ঃ হ্যাঁ, সরকার তো সব জানে।

বি. ম. ঃ *আপনি যেহেতু সরকারী ডিপার্টমেন্টে ছিলেন – আপনি বলতে পারবেন – সরকার এটা নিয়ে কি ভাবছে?*

বসু রায় ঃ সরকার ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমানোর কথা বার বার বলছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন অ্যাক্ট ২০০৫ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতা শহরেও টিউবওয়েল বসাতে হলে পারমিশন নিতে হবে। সরকার এটা থেকে একটা জরুরী ক্লজ তুলে দিলো যে – সেফ ব্লকে যতখুশি টিউবওয়েল করা যাবে। হাই হর্সপাওয়ার মেশিন দিয়ে তুললেও কোন পারমিশন নিতে হবে না। তারপর হাজার হাজার টিউবওয়েল বসে যাচ্ছে। কেন বসছে? **জল বিক্রি করার ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গে একটা বিশাল ব্যাপার।**

কলকাতাতেও একইরকম ছিলো। "ক্যালকাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স অথরিটি"-র কাছ থেকে পারমিশন নিতে হত। সেটাও সরকার তুলে দিয়েছে।

বি. ম. ঃ *কবে?*

বসু রায় ঃ এই নতুন গভ্‌মেন্ট।

বি. ম. ঃ *যেখানে মানুষের জলের প্রয়োজন রয়েছে, তাকে যদি জল তোলা বন্ধ করতে বলা হয়; ন্যাচারালি তো বন্ধ করার তার কোন জায়গা নেই। সরকার কি তাহলে নেগেটিভ পদক্ষেপগুলি বাধ্য হয়েই নিচ্ছে?*

বসু রায় ঃ সেটা আমি জানি না। সরকারের এখানে নিশ্চয়ই পপুলিস্টিক একটা আইডিয়া আছে। আমি এই জায়গায় চাষীদের আটকালাম না। চাষীরা যতখুশি জল তুলুক – কারো পারমিশন নেওয়ার দরকার নেই। সেটা সত্যি কি চাষীদের পক্ষে ভাল হল?

তারা ঘটিবাটি বেচে টিউবওয়েলটা বানাচ্ছে। সেই টিউবওয়েলের সেচ ক্ষমতা এত বেশি যে – একটা টিউবওয়েল ৩০ বিঘা জমি চাষ করতে পারে এই বোরো সিজনে। অন্য সময়ে লাগে না – বোরো সিজনে লাগে। এমনিতে ল্যান্ড হোল্ডিং পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে কম। বোরো সিজনে ৩০ বিঘা জমি গ্রামের মধ্যে একলপ্তে পাওয়া তো মুসকিল হয়ে যায়। যদি পেত তাহলে কিন্তু তারা পয়সাটা তুলতে পারত। আলটিমেটলি কি হল? যে জমিটা তিনজনে চাষ করলে পয়সাটা তুলতে পারত, সেখানে পনের জন লোক চলে এলো। কারুরই পয়সা পকেটে পড়ল না। আলটিমেটলি অধিকাংশ টিউবওয়েলগুলো বসে গেলো।

আজকাল তো সবজায়গায় হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে। কলকাতায় ওয়াটার লেভেল অলরেডি "মিন সি লেভেল"-এর তলায় চলে গেছে। কলকাতার অ্যাভারেজ হাইট ৬ মিটার। এখানে যদি আপনার ওয়াটার লেভেল হয় ১৫ মিটার, তাহলে আমরা তো সি লেভেলের ৯ মিটার নিচে চলে গেছি। এবার স্যালাইন ওয়াটার ঢুকতে থাকবে। অলরেডি স্যালাইন ওয়াটার প্রবলেম তো কলকাতায় শুরু হয়ে গেছে। আরও বাড়বে।

বি. ম. ঃ *এতে কি আর্সেনিক বাড়তে পারে?*

বসু রায় ঃ আর্সেনিক বাড়বে কিনা বলা যাবে না। আর্সেনিক জিওজেনিক কারণে। আর্সেনিক মাটির তলায় রয়েছে। যত টিউবওয়েল বেশি তৈরি হবে – বেশি লোকে জলটা খাবে। বেশি লোকের উপর ম্যানিফেসটেশন হবে।

বি. ম. ঃ *যেখানে এখনও আর্সেনিকের ভয়ঙ্কর অবস্থা নেই বা আর্সেনিক দুস্থ নয়, সেখানের ভূগর্ভস্ত জলে যে*

"ভবিষ্যতে আর্সেনিক কনটামিনেটেড হবে না" – একথা কি বলা যায়?

বসু রায় ঃ সেটা বলা যায়। যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এসব এলাকায় আর্সেনিকের বিপদ থাকবে না। কারণ ওখানে সোর্সটাই নেই। কিন্তু যে আর্সেনিক দুস্থ অঞ্চলগুলোর কথা বলছি – সেগুলির মধ্যে কোন একটা জায়গায়, ধরুন হাওড়ার একটা ব্লকে – এখন না থাকলেও পরবর্তীকালে পাওয়া যেতে পারে।

বি. ম. ঃ *তাহলে আপনার কথা শুনে মনে হয় যে, সাধারণ মানুষের সচেতনতার থেকেও ব্যবস্থাপনায় সরকারের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়াটা খুব বেশি জরুরী।*

বসু রায় ঃ আমি বলব যে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। সরকার কাজটা করছে, তার ক্ষমতানুযায়ী। বলছে ..., সেমিনার করছে।

বি. ম. ঃ *এটাই কি এক্ষেত্রে সরকারের প্রধান কাজ?*

বসু রায় ঃ সরকারী লেভেলে যেরকম কাজ হয় সেরকমই হচ্ছে। যারা সরকারী চাকরী করে, তারা কাজ করছে না তা নয়। হয়ত তাদের মধ্যে ততটা আন্তরিকতা নেই। বারবার পঞ্চায়েতের লোকের কাছে বলার পরেও পাত্তা দেয় না। পঞ্চায়েত লোকেরা ভোট নিয়ে চিন্তিত। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমার মনে হয় – সরকারী লেভেলে এই চেষ্টাটা, সচেতনতাটা নেই – তা নয়। কিন্তু **প্রায়োরিটি কোনটাতে** আছে – সেটা নিয়েই কথা। **পঞ্চায়েত ভোট না ড্রিংকিং ওয়াটার?** এই আর কি।

বি. ম. ঃ *প্রকৃতির যেখানে চারভাগের তিন ভাগই জল সেখানে জল সংকট আসাটা কি স্বাভাবিক?*

বসু রায় ঃ প্রথম কথাটা হচ্ছে ওয়াটার হারভেস্টিং। প্রাইমারী ওয়াটার সোর্স – বৃষ্টির জল। এই বৃষ্টির জল মাটি হয়ে ভূগর্ভে চলে যায়। বৃষ্টির জল আমরা আর পারকোলেট করতে দেবো না। বৃষ্টির জলকে আমি আটকে রাখব।

বি. ম. ঃ *কিভাবে?*

বসু রায় ঃ তার বহু রকম টেকনলজি বেরিয়ে গেছে। সরকার সাবসিডি দিয়ে এটা করে দিচ্ছে। ওয়াটার হারভেস্টিংকে সরকার ম্যান্ডাটারি করেছে।

দেখা গেছে কলকাতার রেইনফল যদি ১.৫ মি. হয়, আর যদি একটা ১০০ বর্গ মিটার জলাধার হয়, তাহলে প্রায় ১৫০ কিউবিক মিটার জল পাওয়া যায়। এটা দিয়ে একটা বাড়িতে প্রায় ৬ মাসের বাসন মাজার কাজ করা যেতে পারে। এই জলটা আপনি কি করছিলেন? মাটি থেকে তুলছিলেন। এবার কি করলেন? এই জলটা আপনি ব্যবহার করে মাটিতে পাঠিয়ে দিলেন; অর্থাৎ আপনি গ্রাউন্ড ওয়াটারকে রিচার্জ করলেন।

এছাড়াও আজকাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কিছু কিছু জায়গায় কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিকে ম্যান্ডেটারী করেছে যে তাদেরও ৪০-৫০% জল ধরে রাখতে হবে। কিন্তু এগুলো সমস্তই আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

চেন্নাইয়ের জলের সমস্যাটা হয়ত জানেন। ড্রিংকিং ওয়াটার পাওয়াই যায় না। সার্টেন এরিয়ায় যদি বাড়ির প্ল্যান করে – ওয়াটার হারভেস্টিং ম্যান্ডাটারী। অর্থাৎ সেই রুফে যে পরিমাণ জল পড়বে, সেই জলটাকে ফিল্টার করে জলটাকে ব্যবহার করা। এটা না থাকলে ওরা কোন বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করছে না। আমরাও এখানে ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে বলেছিলাম ঐ সিস্টেমটা চালু করতে। ওরা নাকি দেখছে – কতদিন আমি জানি না।

বি. ম. ঃ *সেটা তো ব্যক্তিগত উদ্যোগে করতে হবে।*

বসু রায় ঃ না, টেকনলজি ওরা আপনাকে দিয়ে দেবে। আপনাকে সুপার ভিশন করে দেবে। এস্টিমেট বানিয়ে দেবে। প্রজেক্ট বানিয়ে দেবে। সমস্ত হেল্প ওরা করবে। এইবার ধরুন এক লক্ষ টাকা খরচা হবে টোটাল ব্যাপারটায়, সেখানে ওরা হয়ত ৫০ হাজার টাকা সাবসিডি দেবে। গ্রামের মধ্যে যেগুলো করছে সেখানে ১০০% সাবসিডিও আছে।

বি. ম. ঃ *একটা হলে আমাকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। আমি পশ্চিমবঙ্গ বলছি না; অল ওভার ইন্ডিয়ার কথা বলছি।*

বসু রায় ঃ রাজ্যের বাইরে আরও বেশি করে এই জিনিসটা করা হয়। ধরুন – গুজরাটে, রাজস্থানে। আপনি জানেন – ওখানে কি করেছে? সমস্ত সবুজ করে দিয়েছে। গুজরাটে আমি দেখে এসেছি – তারা সব লে-ম্যান। তারা কেউ ইঞ্জিনিয়ার নয়। তারা কান ধরে ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের দেখিয়ে দিতে পারে – কিভাবে করা যায়।

ছোট্ট একটা নালা ছিলো। সেই নালাটা খুঁড়েছে। যেখানে জলের পুরনো দাগগুলো ছিলো, সেই জায়গাগুলো জয়েন্ট করে দিয়েছে। দু'বছর – তিন বছর পর সমস্ত ওয়াটার লেভেল গ্রামের মধ্যে উঠে এসেছে।

বি. ম. ঃ *সাউথ ইন্ডিয়া কতগুলো যে, ড্রিংকিং ওয়াটার পারপাস মেরিন ওয়াটার প্ল্যান্ট বসিয়েছে; সেই ব্যাপারটা কি*

রকম?

বসু রায় ঃ প্রচন্ড কস্টলি প্রসেস একটা। প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগবে ওটাকে করতে। ডি-স্যালিনাইজেশন টেকনলজি। কস্টলি ব্যাপার। আমার মনে হয় এটা ভায়াবেল হবে না।

বৃষ্টির জলটাকে যদি ধরে রাখতে পারি, কম হোক, অনেকটা জলের সমস্যা ওটা থেকে মিটে যাবে। আলটিমেটলি আমাদের রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বি. ম. ঃ *ফ্রি অফ কস্ট তো নয়, স্বল্প খরচে ...*

বসু রায় ঃ এমনকি ফ্রি অফ কস্টেও হতে পারে। আপনি যদি সরকারকে আইডিয়াল প্লেস দেখান। ধরুন আপনা বাড়িটা ৫০০ বর্গফুট। এটার জন্য সরকার হয়ত খুব একটা বেশি ঝাপাবে না। কিন্তু ২০০ বর্গ মিটার একটা এরিয়া যদি পায়; গভর্নমেন্ট তো করে দিয়েছে, ফ্রিতে। সল্টলেকের বড় বড় দু'তিনটা অফিস বাড়িতে করে দিয়েছে, বিনা পয়সায়।

বি. ম. ঃ *গ্রামাঞ্চলে?*

বসু রায় ঃ গ্রামাঞ্চলে বিনা পয়সায় করে দিতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তো এই রুফটা পাওয়া যাবে না।

বি. ম. ঃ *তাহলে যাদের এরকম বড় বড় ছাদ নেই? বস্তি এলাকা বা গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট পরিবারে?*

বসু রায় ঃ তারা কি করে এই জিনসিটা করবে? তাদের পক্ষে এটা কখনো করা সম্ভব নয়।

চেতনাটা কিন্তু দরকার – আপনারা যদি তৈরি করতে পারেন। জলের সংরক্ষণ ও অপচয়টা বন্ধ করা দরকার। তাহলে কিন্তু অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়। আজকে যদি পশ্চিমবঙ্গে – কলকাতাতে একটু জল বিক্রির পয়সা নেওয়া হত, তাহলে মানুষ বুঝতে পারত জলটা কতটা দামী।

বি. ম. ঃ *মানুষ তো ১৪ টাকা লিটারেরও জল খাচ্ছে।*

বসু রায় ঃ ঠিক তাই।

বি. ম. ঃ *সুবিধাটা এখনো লিমিটেড লোকেরাই তো পাচ্ছেন!*

বসু রায় ঃ এটা সুবিধার প্রশ্ন নয়। বলা উচিত – ওয়াটার হারভেস্টিং একটা টেকনোলজি, যেটাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে আগামী দিনে। কিন্তু **যার জমি নেই, মাথার উপর অতবড় ছাদ নেই, সে কি জল পাবে না?**

বি. ম. ঃ *এটাই তো আমাদের প্রশ্ন। সকল মানুষের তরফ থেকে "বিজ্ঞান মনস্ক"র প্রশ্ন। আপনাকে ধন্যবাদ।*■

●*২০ পৃষ্ঠার পর* ➔

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা ও তার সমাধান

ক্রয়ক্ষমতা আছে এমন মানুষের কাছে জলবিক্রি চলছে, ফিল্টার বিক্রি চলছে। বিপদ দেখলে পৌরসভা-সরকার সাধারণ মানুষকে পুকুরের জল ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের নামে সমস্যাকে সামনে রেখে চলছে জল ব্যবসা। অনেক নামী-দামী কোম্পানি অন্য ব্যবসা ফেলে জলব্যবসায় নেমেছে।

তাই, বিজ্ঞান মনস্ক, সমাজ সচেতন মানুষের সব দেখে, সব বুঝে চুপ করে বসে থাকা কাজ নয়। আমাদের দাবী তুলতে হবে

(ক) প্রতিটি নাগরিককে জীবাণু এবং জৈব-অজৈব রাসায়নিক মুক্ত পানীয় জল বিনা পয়সায় সরবরাহ করতে হবে। জল নিয়ে চলা সমস্ত ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

(খ) এলাকার বৈশিষ্ট অনুসারে কোথাও নদী-জলাশয়ের পরিশুদ্ধ জল, কোথাও জলাধারে ধরে রাখা পরিশুদ্ধ বৃষ্টির জল, কোথাও আর্সেনিক ও রাসায়নিকমুক্ত গভীর নলকূপের জল প্রকল্প গ্রহণ করে সুষ্ঠু জলবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(গ) পানীয় জল থেকে আর্সেনিক ও অন্য রাসায়নিকের প্রভাবে অসুস্থ সকল মানুষের সর্বোত্তম আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিখরচায় সরকারকে করতে হবে। প্রতিটি ব্লক স্তরে আর্সেনিক ক্লিনিক খুলতে হবে।

(ঘ) আর্সেনিক ও অন্য রাসায়নিকের প্রভাবে মৃত মানুষদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত মানুষদের ন্যায় সরকারী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই দাবীগুলির যৌক্তিকতা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং দাবীগুলি আদায়ের লক্ষ্যে মানুষকে সংঘবদ্ধ করাই বিজ্ঞানমনস্কতা। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে তাই এই দাবীর পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।■

তৃতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ১-২❖জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৩

গল্প

আলেয়ার আলো

কাজল কুমার রায়

বিশ বছর আগের তিনমাইল হাট আর বর্তমানের তিনমাইল হাট স্টেশনের চেহারার অনেক বদল ঘটে গেছে। গ্রামের বুক চিড়ে যাওয়া এন এইচ থারটি সেভেন এক লেনের বদলে এখন দুই লেনের হয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে ব্যাটারি চালিত টিভি এসেছে। ক্লাশ এইট পর্যন্ত সর্বশিক্ষা মিশনের স্কুল হয়েছে, দোকানে দোকানে ফেয়ার এন্ড লাভলি আর মোবাইল রিচার্জ কার্ড পাওয়া যায়। ট্রেনের ইঞ্জিনে জল দেওয়ার ওয়াটার কলম বন্ধ হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক লাইনের সিগন্যাল, রুট রিলে কেবিন, সেলফ্ অপারেটিং প্যানেল বোর্ড, ইউ টি এস টিকিট মেশিন ... সবই বিশ্বায়ন আর মর্ডানাইজেশনের কল্যাণে। এখন স্টেশনে ট্র্যাফিক, গ্যাং ম্যান, সিগন্যাল মিলিয়ে মোট ২৬ জন, আগে ছিল ৯৮। এত কিছুর বদল হয়েছে তবু আশেপাশের গ্রামগুলি – ট্যাপাগছ, মোনাগছ, নিশাগছ, তিনমাইল,গৌড়াঙ্গগছ, লক্ষ্মীগছ, বিলাতিবাড়ি, ভক্তিয়াডাঙ্গির মানুষের মনের আঁধার কাটে নি।

বয়স্ক আর মাঝবয়সীরা বলেন 'আলেয়ার আলো' নাকি টেনে নিয়ে গেছে গ্রামের অনেককে। মকবুল হোসেনের বউ রাতে ঝগড়া করে বেড়িয়েছিল বাড়ির বাইরে, আর ফেরেনি। সবার বারণ সত্ত্বেও স্টেশনের পয়েন্টম্যান, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার রাম পিরিত সিং আলেয়ার আলো ধরতে গিয়ে নাকি বেঘোরে প্রাণ দিয়েছেন !

আলেয়ার আলোর উৎপত্তিস্থল ট্যাপাগছের পাশের কবরখানায়। এখানে বছরের বেশী সময় জল থাকে। তিন চারটে পাকুর গাছ আর বাঁশঝাড়। কুকুরের মত বড় বড় শেয়ালগুলি এখানে ঘুরে বেড়ায়। কবরের মরাগুলি টেনে বার করে, গ্রামের হাঁস মুরগী, দিঘীর মাছ নিয়ে যায়। এরা সাঁতার জানে। এই আলো দিনে দেখা যায় না, অন্ধকার মাঝরাতে; অমাবস্যার রাতে একবার কিংবা দুবার।

রামপিরিত সিং মজদুর ইউনিয়নের আলুয়াবাড়ি জোনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল। '৭৪-এ রেল স্ট্রাইকে 'রিমুভ' হয়ে পরে 'রিভোক' হয়েছিল। ভীষণ ডানপিটে, কোনও অন্যায় বরদাস্ত করত না, ইউনিয়নের মিটিং নিয়ে পি ডবলু আই, স্টেশন মাস্টারের সাথে ঝগড়া করত, আইন দেখাত। কেউ ওকে ঘাঁটাতে চাইত না। সে দু-তিনবার লক্ষ্য করার পর সকলকে চমকে দিয়ে একদিন বলল আলেয়ার আলো ধরতে যাবে। কারও বারণ শুনল না।

সে দিন ছিল অমাবস্যার রাত। হাতবাতি আর লম্বা বেতের ডান্ডা নিয়ে রাত একটার সময় স্টেশন থেকে রওনা দিল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সকালে দেখা গেল দুই কিলোমিটার দূরে কাদায় মাখামাখি হয়ে পরে আছে, মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠে গেছে। মাঠে লাঙ্গল দিতে এসেছিল ইকবাল হোসেন, হাতবাতি দেখে বুঝল রেলের লোক। তখনও বুক ধুক পুক করছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে খবর দিল। সকালবেলা দার্জিলিং মেল থামিয়ে গার্ডের রেকে করে এনজিপি স্টেশন, সেখান থেকে রেলের হাসপাতাল। ২৪ ঘন্টা পর মারা যায়। পোস্ট মর্টেম হয়েছিল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। সকলেই নিশ্চিত হল আলেয়ার আলো ধরতে গিয়েই এ বিপত্তি !

এরপরেও এরকম আরও হয়েছে। স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়া নিশাদ মিঞার বড় মেয়ে, কালু মন্ডলের সোমত্ত মেয়ে, পরীক্ষায় ফেল করা দুলু বিশ্বাসের বড় ছেলে ... সবাই বলল, সকলকে আলেয়ার আলো নিয়ে গেছে।

তিনমাইল স্টেশনে পয়েন্টম্যান হয়ে এসেছিল কার্তিক পাল। মাথায় গোলমাল ছিল, ঠিকমত কাজ করতে পারত না, গাড়ী মার খেয়ে যেতো। মাস্টার মশাই বললেন ওকে দিয়ে হবে না। ডিভিশন অফিসে জানালেন।

কার্তিকের বদলে এল দেবব্রত ঘোষ। আমরা ওকে দেবু বলেই ডাকতাম। দেবুকে সিগন্যাল বাতি জ্বালতে হতো, সকাল বেলায় তা নামিয়ে এনে কার্বনের ঝুল পরিষ্কার করতে হত, আবার স্টেশনে অপারেটিং-এর কাজও করতে হত। ওর কাজটা একটু বেশীই ছিল। সে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট জোগার করে ফেলল। কালু মন্ডলের বোবা ছেলে সুকু। সন্ধ্যায় সিগন্যালের বাতি জ্বালিয়ে দেবে আবার সকালে তা নামিয়ে

এনে পরিষ্কার করবে। বেঁচে যাওয়া কেরোসিন সে নিয়ে নেবে। দেবুও খুশি, সুকুও খুশি। প্রায় দুই থেকে আড়াই লিটার খুচরা তেল হতো। রেলের খাতায় এর হিসাব হয় না। সুকু দেবুর ন্যাওটা হয়ে গেল।

কিছুদিন ধরে দেবু লক্ষ্য করল অমাবস্যার রাতে বহু দূরে একটা আলো কাঁপতে কাঁপতে এক কোণা থেকে অন্য কোণায় ঘুরে বেড়ায়। সে স্টেশন মাস্টারকে বলল। মাস্টার মশাই বললেন 'ও দিকে তাকাবে না'। অন্য কলিগদের বলল। সকলে বলল রামপিরিতের কথা। আবার এও বলল যে ওই আলো আমাদের ক্ষতি করে না, কুয়াশার রাতে রেলে কাটা ভূতেরাও তাই। দেবু এবার সুকুকে বলল সে আলেয়ার আলো ধরতে যাবে। সুকু মাথা নেড়ে নিষেধ করল। দেবু বলল, তবে সে একাই যাবে। সুকু ঘাড় কাত করে, হাত নেড়ে বলল, তবে সেও যাবে দেবুর সঙ্গে।

সেদিন ছিল রবিবার। দেবব্রত'র রেস্ট ডে। মাস্টার মশাইকে বলেছিল। যথারীতি মাস্টারমশাই বলেছিলেন তিনি কোন রিস্ক নেবেন না। অন ডিউটিতে ওসব চলবে না। রামপিরিত অন ডিউটিতে আলেয়ার আলো ধরতে গিয়ে মরেছিল। পুলিশ-কোর্ট অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়েছিল মাস্টারমশাইকে। সব অফিসার ব্যাপারটা জেনে গেছিল। স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে একজন 'অন ডিউটি' স্টাফ কিভাবে যেতে পারে! ফুল কম্পেনসেশন – মড়া পোড়ানো, পোস্ট মর্টেমের খরচ আর কম্পেনসেশন গ্রাউন্ডে পোষ্যের চাকরি দিতে হয়েছে রেলকে। দেবু ঠিক করল রেস্ট ডে অথবা ছুটি নিয়ে আলেয়ার আলো ধরতে যাবে।

সেদিন ছিল অমাবস্যা, দেবুর রেস্ট ডে। সকালে ভোজালিটা নিজে ধার করল, সুকুকে দিয়ে আমগাছ, কাঁঠাল গাছে তার ধার পরীক্ষা করল। তারপর মুরগীর উপর তা পরীক্ষা করে দুপুরে মুরগীর মাংস আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে নিল।

রাত একটা। বহু দূরে নির্দিষ্ট স্থানে আলেয়ার আলোর যাত্রা শুরু হল।

দেবুর বাবা ছিল রেলের এ ওয়াই এম। ছেলেকে পড়াতে চেয়েছিল অনেকদূর। দেবুর পড়তে ভাল লাগত না। ঘুড়ি ওড়ানো, আম পাড়া, লাট্টু খেলা, তাস খেলা, গুলতি দিয়ে পাখি শিকার, মাছ ধরাই তার প্রিয় ছিল। মাধ্যমিকে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে পড়া ছেড়ে দিল একেবারেই। বাবা ইয়ার্ড মাস্টার কে এস রায়'কে ধরে পোর্টারে ঢুকিয়ে দিল। সব সময় বলত "মর, মর। তুই বংশের কুলাঙ্গার।" দেবু জানত সে মরলে কেউ কাঁদবে না।

সুকুকে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। সুকুর বাবা শাসিয়ে দিল –'ওকে সঙ্গে নেবেন না'। এ এস এম যাদবজী বলল আলেয়ার আলোর সাবুদ এনে দিলে ৫০ টাকা দেবে। দেবু চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল। মাস্টার মশাই বিন্দেশ্বরী ঝাঁ'জী রিস্ক নেন নি, বললেন সাবুদ আনলে পাড়াশুদ্ধু লোককে জিলিপি খাওয়াবেন। দেবুকেও ৫০ টাকা দেবেন। দেবু জানত ভূতেরা আলো ভয় পায়। হাতে লোহা থাকলে ভূত কাছে আসতে পারে না। ওর ঠাকুরমা মরার সময় জেনেছিল।

দেবুকে শেষবার দেখতে সবাই স্টেশনে এসেছিল। পৌষের রাত, হালকা কুয়াশায় মাঠ ঢেকে গেছে। বহুদূরে দেশলাইয়ের শলাইয়ের আলোর মত আলোটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে, আবার দপ্ করে নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলছে ...। দেবুর গায়ে সোয়েটার, পায়ে কেডস্, চোঙা ফুলপ্যান্ট। এক হাতে ভোজালি আর অন্য হাতে রেলের সিগন্যাল হাত বাতি। শেষবারের মত স্টেশন মাস্টার বারণ করল আর মনে মনে ভাবল 'ওকে রামপিরিত ডাকছে। ফিরে আসিস ভাল করে ফুল মালা দেব'। যাদবজী বললেন 'চিন্তা করিস না, ফুলমালা পড়িয়ে তোর লাশ মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।' সুকু আকারে ইঙ্গিতে বলল 'ভয় পেও না, সাবুদ নিয়ে ফিরে এস'।

আসতে আসতে বিন্ধ্যেশ্বরী বাবুর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ফিকে হয়ে এল। লোকজনের কথাবার্তা আর শোনা যাচ্ছে না, স্টেশনের কেরোসিন বাতি আর দেখা যাচ্ছে না।

মাঠে আমনের ধান কাটা হয়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা গোড়াগুলি গোড়ালিতে লাগছে। শিয়ালগুলি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ওদের চোখগুলি জ্বলছে। হাতের ভোজালিটা মাটিতে রেখে সে শক্ত মাটির ঢেলা তুলে নিল। ছোঁড়ার পর বুঝল তা বোধহয় কোন শিয়ালের শরীরে পড়েছে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে শিয়ালটা দূরে সরে দাঁড়াল। সামনে গিয়ে দেখল একটা মরা নিয়ে ওদের টানাটানি চলছে। বোধহয় সদ্য কবর দেওয়া। পাশ কেটে দেবু এগিয়ে গেল। শিয়ালগুলি আবার মরার কাছে ফিরে এল। সামনের দিকে এগুতে নিয়ে দেবুর ডান পা'টা দুলকি-তে আটকে গেল। দুলকি হল মাটির উপরের স্তরের হালকা আবরণ, নীচে জল। হাতের ভোজালির উপর ভর

দিয়ে ডান পা'টা তুলে নিল। কেডসটা মাটির মধ্যে আটকে রইল। সামনের দিকে এগিয়ে চলল দেবু, মাথার উপর কর্কশ স্বরে উড়ে যাচ্ছে প্যাঁচা। মনে হচ্ছে সবাই তাকে ঘিরে ধরছে। মনে হয় কতকাল ধরে হেঁটে চলেছে দেবু, যেন অনন্তকাল। নিজের পদধ্বনি, নিশ্বাসের শব্দ, হৃদপিন্ডের আওয়াজ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, শিয়ালের হুয়া হুয়া, প্যাঁচার কর্কষধ্বনি তার সমস্ত সত্তাকে আবৃত করে রেখেছে, যত কাছাকাছি চলে আসছে আলেয়ার আলো।

আলোটার উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রথমে মাটির থেকে উঠে আসে তারপর তার রেখাটা আস্তে আস্তে আরও উপরে উঠে আসছে। কিছুক্ষণ যাবার পর আবার মাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছে নীচু হয়ে। এতক্ষণে দেবুর মনে হল যেন জলের উপর দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং আবার তা মাটিতে নেমে এল। সে ভোজালিটা শক্ত হাতে ধরল। যে শব্দের কোলাহল এতক্ষণ ছিল তাতে যেন নিঃশব্দতা চলে এসেছে। আর কিছুর ডাক শুনতে পাচ্ছে না দেবু। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল দেবু। কালো তিনটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে। ওরা ওই পাকুড় গাছের তলায় ঘোরাঘুরি করছে। দেবুর মনে পড়ল ওখানেই ফাঁসি দিয়ে মরেছে ট্যাপাগছ, নিশাগছ, সোনাগছের মানুষেরা। এখানেই ঘুরে বেড়ায় কবরে শোয়া মানুষেরা। আরও শক্ত হাতে ভোজালিটা ধরে দেবু আরও এগিয়ে গেল। বলল, এই তোরা কে? কেউ উত্তর দেয় না। কেবল আলেয়ার আলো পাকুড় গাছগুলির এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যাচ্ছে অশরীরিদের বার্তা নিয়ে।

দেবু আরও সামনে এগিয়ে যায়। হ্যাঁ কালো তিনটি ছায়ামূর্তি, ওরা মানুষ না ভূত ! কিছু তো বটেই। দেবু আবার চিৎকার করে বলল এই তোরা কে? বিস্ময় কেটে গিয়ে মানুষের গলাতেই একজন বলল, "বাবু আমরা মদেশিয়া (মদেশিয়ার 'ম' অর্থাৎ সমতলে বসবাসকারী, 'দেশিয়া' অর্থাৎ অঞ্চলের অধিবাসী। এক কথায় সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী – ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি)। দেবু উত্তেজিত হয়ে আবার চিৎকার করে বলল 'এই তোরা কি করছিস?' ওদের একজন বলল, 'বাবু আমরা পাখি ধরছি'। উত্তেজনায় আরও সামনে দিকে এগিয়ে যায় দেবু। এই পৌষের শীতেও তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। হ্যাঁ, মানুষেরই শব্দ, তাও একেবারে বাংলায়।

ওরাও দেবুকে লক্ষ্য করছিল। ওরা তিনজনেই দেখছিল যে একজন লোক বাতি হাতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। ধারালো ভোজালির কোণাটা ততক্ষণে দেবুর হাতের তালুতে বসে গেছে, দেবু টের পায়নি। দেবু লক্ষ্য করল ওরা সত্যিকারের জলজ্যান্ত রক্ত মাংসের মানুষ। গাছের দুই প্রান্তে দুটি টিন, পাশ দিয়ে জাল পাতা। বিশাল লম্বা জাল খুঁটি দিয়ে গাছের ডালগুলির সঙ্গে বেঁধে এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়ানো। অপর প্রান্তে আর একটা টিন। দুজন গাছে উঠে গেল। এক প্রান্তের টিনটার কেরোসিন তেলে মশালটা ডুবিয়ে দিল, তারপর দেশলাই দিয়ে মশাল ধরিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে মশাল নিয়ে যাত্রা শুরু করল, খুব আস্তে আস্তে। অন্যদিকে দুজন গাছের ডালে উঠে গাছগুলিকে ঝাঁকি দিতে শুরু করল। গাছের পাখিগুলি অমাবস্যার অন্ধকারে, আতঙ্কে উড়তে লাগল। আলোর আকর্ষণে ওরা জালের উপর আছড়ে পড়তে শুরু করল। আস্তে আস্তে মশাল নিয়ে অপর প্রান্তে এসে মুখঢাকা টিনের মধ্যে জ্বলন্ত মশালটা ডুবিয়ে দিল। মশাল দপ্ করে নিভে গেল। দুজন গাছ থেকে নেমে এল। তিনজন মিলে পাখিগুলিকে ঝুড়ির খাঁচায় বন্দী করল। দেবু বুঝতে পারল পাখিগুলি 'আলেয়ার আলোর' বাঁধনে পড়েছে।

দেবু ভোজালিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কখন যে হাত কেটে গেছে টের পায় নি। হাতে রক্তের ফোঁটা হাতবাতির কাঁচের উপর পড়ল। আলোর উপর রক্তের ফোঁটা। দেবু লজ্জিত হল। ওরা দেখতে পেয়ে কাজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল 'দাঁড়ান, রক্ত বন্ধ করে দিচ্ছি।' একজন একটা গাছের পাতা তুলে এনে পাথর দিয়ে ছেঁচে রস বের করল। তারপর পাতাশুদ্ধু রসটা কাটা জায়গায় চেপে ধরল। ওদের সবার হাতের স্পর্শ অনুভব করল দেবু। ওরা নিজেদের কাজে আবার ফিরে গেল।

এখন চারটে, ভোর এত সুন্দর হয় তা দেবুর জানা ছিল না। মনে হয় আকাশে যেন চাঁদের আলো। ওরা সব জিনিসপত্র গুটিয়ে নিচ্ছিল। দেবু জেনেছিল ঐ পাখিগুলি বিক্রি হয় ইসলামপুর বাজারে। টিয়া, ময়না, শালিখ, ফিঙে, দোয়েল, কাকাতুয়া, ঘুঘু ... । এটাই ওদের জীবিকা। ইসলামপুর বাজারে পাখি ধরার পাইকাররা আসে। শুনেছে এগুলি শিলিগুড়ি, মালদা-র বাজারে ভাল দামে বিক্রি হয়। যাবার সময় একজন বলল, 'বাবু পাখি নেবেন নাকি'? দেবুর সাবুতের কথা মনে পড়ল। 'নিন বাবু'। দেবু ঘুঘু-কে হাতের মধ্যে নিল। ওরা আস্তে আস্তে হাইওয়ের দিকে চলে গেল।

দেবুও রওনা দিল স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সব অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। আল ধরে দেবু সামনের

দিকে এগিয়ে চলল। স্টেশন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, সকালের ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ধূয়া ছড়িয়ে। এক পরম নিশ্চিন্ততায় দেবু এগিয়ে চলল। স্টেশনে ভিড়, জটলা। বোধহয় প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে লোকজন নেমেছে। স্টেশন থেকে সকলে দেবুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সুকুই প্রথমে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল দেবুকে। দেবুও সুকুকে। হ্যাঁ, সকল স্টাফরাই নানা আশঙ্কা নিয়ে গভীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সকলে জয়োল্লাস করতে করতে দৌড়ে এসে দেবুকে বরণ করে নিল। দেবু ঘটনাটা বলল সকলকে, সাবুতও নিয়ে এসেছে সে। মাস্টার মশাই বিন্ধ্যেশ্বরী ঝাঁ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টারমশাই যাদবজী এবং তারপর সকলে ঘুঘুটাকে স্পর্শ করল।

দেবু ঘুঘুটাকে স্পর্শ করল। সূর্য পূর্বাকাশে দিনের আলোর সূচনা ঘটিয়েছে। ঘুঘুটাকে সামনে রেখে দেবু বলল, 'স্টেশনের আলেয়ার আলো তোমায় মুক্তি দিলাম' ঘুঘুটা জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল উজ্জ্বল আকাশে। ■

রিপোর্ট

"এস ভাই এস বোন গড়ে তুলি আন্দোলন"

– শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের স্লোগান

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩, 'লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চের' আহ্বানে রবীন্দ্র সদন চত্বরে বেলা ৩.৩০ মিনিটে এক জনসমাবেশ হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে, এই দিনে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের ঢাকায় শাহবাগ স্কোয়ারের আন্দোলনকারীদের জন্য সংহতি জ্ঞাপন করেন। মৌলবাদের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্ম ও জনতার এই সংগ্রাম বিশ্বের বুকে একটা আলাদা রাস্তা দেখাচ্ছে – এটাই বিভিন্ন বক্তার অভিমত। আবার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে – এই আন্দোলনকে ঘিরে ক্ষমতার যে অদ্ভুত বৃত্ত তৈরী রয়েছে – অবশেষে এই বৃত্তগুলি আন্দোলনকে গ্রাস করবে না তো? তবুও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সকল যুক্তিবাদী মানুষদের অনুপ্রাণিত করে। এবং গভীর প্রত্যয়ে জানানো হয় যে, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকেই আন্দোলনগুলি উঠবে – ইতিমধ্যেই অনেক লক্ষণও পরিস্ফুট হচ্ছে – তার লাগাম যেন যুক্তিবাদী জনতার হাতেই থাকে। স্লোগান, আবৃত্তি, সঙ্গীতে মুখর ছিল এই সমাবেশটি। অবশেষে একটি সংক্ষিপ্ত পদযাত্রার মাধ্যমে এটি সুসম্পন্ন হয়। ■

'পরিপ্রশ্ন'র পাঠক সভা

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা 'পরিপ্রশ্ন' গত ১০ই মার্চ ২০১৩ একটি পাঠক সভার আয়োজন করে। যেখানে অন্যান্য বেশ কয়েকটি সংগঠনের পাশাপাশি 'বিজ্ঞান মনস্ক'কেও আমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বের পর্বে পরিপ্রশ্নের উপস্থিত পাঠকবৃন্দ, পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরের পর্বে ছিল একটি আলোচনা 'বর্তমান অস্থির সময় ও ধর্মীয় মৌলবাদ'। প্রথম পর্বে পত্রিকার প্রকাশনা, রচনার মান, ভাষার সাবলীলতার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে যেমন – বর্তমান সময়ে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে রাশিয়া, চীনে তা ব্যর্থ হ'ল কেন? এই প্রশ্নে বিভিন্ন বক্তা তাদের মতামত পেশ করেন। তাদের বক্তব্য হতে যা উঠে আসে তাহল মার্কসের তত্ত্ব অনুধাবনের জন্য অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান সমাজে মানুষের অভাবের মূলেই রয়েছে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। 'বিজ্ঞান মনস্ক'র উপস্থিত প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে 'পরিপ্রশ্ন'র দৃষ্টিভঙ্গী কি? পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। সেটিকে মানব স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারে আপনাদের পত্রিকার বক্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পত্রিকার পক্ষ হতে বলা হয়। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের বিষয়টি পরীক্ষাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। পারমাণবিক বোমা ইতিমধ্যেই মানুষ বর্জন করেছে, আর পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারও মানুষ বর্জন করেছে এবং করবে। পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বক্তব্য এটাই। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় বক্তারা তাদের মনখোলা বক্তব্য বলেন। বর্তমান বাংলাদেশের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, মিশরের বিদ্রোহ, দিল্লির ধর্ষণকান্ডে যুব সমাজের অংশগ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে বক্তব্য রাখেন। একজন বক্তা বলেন মানুষের আসল লড়াই মৌলবাদের বিরুদ্ধে নয় বরং মৌলবাদ যারা টিকিয়ে

রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে। একজন বলেন মৌলবাদ ও তার বিরুদ্ধে লড়াইটিকে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা দরকার। অনেক বক্তা বলেন বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে মৌলবাদ বিরোধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে এটা অনুপ্রাণিত হবার বিষয়। শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সভাগৃহটি ছিল আলোচনা মুখর।■

২৮শে ফেব্রুয়ারী
বিজ্ঞান দিবসে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির কার্যক্রম

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিজ্ঞান দিবসকে উল্লেখ করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নামে একটি বিজ্ঞান সংগঠন একটি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে কলেজ স্কোয়ার চত্বরে। সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনকে তারা আমন্ত্রণ জানান। বিজ্ঞান-মনস্কও সেখানে যায়। বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান সংগঠন পোষ্টারিংয়ের মাধ্যমে ভূপাল গণহত্যা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, খাদ্যে বিষ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। সভাপতি ড: অভিদত্ত মজুমদার তার ভাষণের মাধ্যমে সরকার থেকে গৃহীত এবছর বিজ্ঞান দিবসের থিম 'বৈজ্ঞানিক জীন প্রযুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা'-এর বিরোধীতা করেন এবং বলেন যে এটি আসলে একটি রাজনৈতিক দাবী, বৈজ্ঞানিক নয়। তিনি আরও জানান দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে আসলে কৃষি ব্যবস্থায় কর্পোরেট কন্ট্রোল কায়েম করাই হচ্ছে এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান চেতনা নামে একটি বিজ্ঞান সংগঠন যুক্তিবাদী প্রদর্শনের মাধ্যমে ভন্ড বাবাজি, মাতাজিদের ভন্ডামী তুলে ধরেন যা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়।■

সংগঠন সংবাদ

মূর্শিদাবাদের মহরুল ক্লাবে বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

মূর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম অঞ্চলের মহরুল ক্লাবে গতবারের মত এবারও বিজ্ঞান মনস্ক আমন্ত্রি হয়। ১০ই জানুয়ারীর ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ প্রসঙ্গে একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে বলা হয় – এদেশে শিল্প-কৃষি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ কোন নতুন বিষয় নয়। বৃহৎ দেশী কোম্পানিগুলি এখন শহরে বড় বড় দোকান খুলছে যেখানে হিরে থেকে জিরে পাওয়া যায়। বর্তমানে নতুন নীতি অনুসারে ওয়ালমার্টের মত বৃহৎ বিদেশী কোম্পানীগুলি এই ধরণের দোকান খুলবে। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে হইচই হচ্ছে যে এর ফলে দেশের সব ছোট দোকান বন্ধ হবে। বাস্তবে এটা সত্য নয়। ওইসব দোকানে তাঁরাই যাবেন যাদের পকেটে যথেষ্ট পয়সা আছে। গ্রামের গরীব মানুষ একশ গ্রাম সরষের তেল কিনবেন পাড়ার মুদি দোকানেই। পুঁজিবাদী বিশ্বে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে নানা রূপের পণ্য বিক্রি হয় নানা ধরণের দোকানে। এটা শুধু এদেশে নয় উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রেও সত্যি। এই নীতিতে কৃষিপণ্যগুলিকেও আনা হচ্ছে। এতে ফড়ে দালালদের বদলে কোম্পানির লোক কৃষকের কাছে যাবে মাল কিনতে। মানুষের অবস্থার বদল হবে না।

এরপর সাপ নিয়ে প্রজেক্টরের সাহায্যে একটি সেমিনার করা হয়। গ্রামীণ দর্শক প্রচুর সংখ্যায় জমায়েত হয়ে অনুষ্ঠান দেখেন। বিষহীন ও বিষমুক্ত সাপ কিভাবে চেনা যায়, বিষাক্ত সাপে কামড়ালে অ্যান্টিভেনাম ছাড়া অন্য চিকিৎসা কেন নাই তা বুঝিয়ে বলা হয়। সাপ নিয়ে মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা কুসংস্কারের স্বরূপ তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে জেলা সদর হাসপাতালগুলিতে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা বাধ্যতামূলকভাবে করার সরকারী নির্দেশিকার ফটো কপি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে চিকিৎসা করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ না চাইলে নির্দেশিকা তাদের দেখাবেন ও চাপ দিতে বলা হয়। এছাড়া সাপের কামড়ে মৃত মানুষের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সরকারী নির্দেশিকাটিও ক্লাবকে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে অবশ্যই আইনসম্মত দাবী রেখে তা আদায়ের প্রয়াস করতে বলা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে উৎসাহীরা সমীক্ষণ ক্রয় করেন।

রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন বইমেলায় সমীক্ষণ

গত ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী তিন মাসব্যাপী সারা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক তার মুখপাত্র নিয়ে হাজির

থাকার ঐকান্তিক প্রয়াস নেয়। বইমেলার পাশাপাশি বোলপুরের পৌষমেলাতেও সমীক্ষণ হাজির ছিল।

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গনে গত ৩০শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বরব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর উত্তরবঙ্গ ইউনিটের পক্ষ থেকে মেলায় প্রথম টেবিল স্পেস নেওয়া হয়। ডেঙ্গু সম্পর্কে নানা পোস্টারে সাজানো ছোট স্টলটি ছিল এত বড় মেলার মধ্যে চোখে পড়ার মত। স্টলে নানা বয়সের মানুষ ভিড় করেন এবং সমস্ত পত্রিকা নিঃশেষিত হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের মানুষের বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। পত্রিকা না পেয়ে বহু মানুষকে ফিরে যেতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।

এক সপ্তাহ পর শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে লিটল ম্যাগাজিনগুলির পক্ষ থেকে ২ দিনের একটি বইমেলা হয়। এই মেলায় মানুষের উপস্থিতি ছিল সীমিত কিন্তু আমাদের স্টলে ভিড় এবং বিক্রি ছিল চোখে পড়ার মত।

সোনারপুর ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুরে স্থানীয় ইউনিটের পক্ষ থেকে এবার প্রথম টেবিল স্পেস নেওয়া হয়। গতবছর অন্য পত্রিকার স্টলে আমরা সমীক্ষণ রেখেছিলাম, এবার নিজস্ব স্টলে সমীক্ষণ রাখা হয়। ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলায় বিভিন্ন বয়সের মানুষ ভিড় করেন এবং বহু মানুষ সমীক্ষণ কেনেন এবং সংগঠনের সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বেহালা ঃ কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বেহালায় স্থানীয় ইউনিটের উদ্যোগে গতবারের ন্যায় এবারও সমীক্ষণ টেবিল স্পেস নেয়। ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের মেলায় সমীক্ষণের স্টলে ভিড় সকলের নজরে আসে। স্টলটি ডেঙ্গু কী ও কেন বিষয়ের উপরে সুদৃশ্য পোস্টারে সাজানো ছিল। এবারে সমীক্ষণের বিক্রি বিগত সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় এবং বহু মানুষ গ্রাহক এবং সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কলেজ স্ট্রীট ঃ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ'র বইমেলায় সমীক্ষণ নিজের স্টল নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মেলায় তেমন একটা ভিড় না হলেও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক / প্রকাশক / সহযোগী ও বন্ধুরা উপস্থিত হন। মেলার সমীক্ষণের ভাল বিক্রি হয়। বহু মানুষ সমীক্ষণকে মাসিক কেন করা হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেন। মেলায় সিদ্ধান্ত হয় প্রতিমাসের শেষ শনিবার শহরের প্রাণকেন্দ্র অ্যাকাডেমি চত্বরে মেলা করা হবে। সেই হিসাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওই স্থানে মেলা হয়।

বোলপুর পৌষমেলা ঃ বীরভূমের বোলপুরে শান্তিনিকেতন পৌষ মেলায় সমীক্ষণ নিয়ে আমরা ২৩-২৫শে ডিসেম্বর হাজির ছিলাম। বহু আগ্রহী পাঠক (বিশেষতঃ ছাত্ররা) সমীক্ষণ সংগ্রহ করেছেন।

আসানসোল বইমেলা ঃ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে স্থানীয় পাঠকদের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার আসানসোলের বইমেলায় সমীক্ষণ হাজির ছিল। ওই মেলায় পাঠকদের পত্রপত্রিকা কেনার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট ভাল। মেলায় সমীক্ষণের সকল সংখ্যাই নিঃশেষিত হয়ে যায়। অনেকে সদস্য ও গ্রাহক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গোচরণে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

গত জানুয়ারী, ২০১৩ দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণে, রাধাবল্লভ সমিতি দ্বারা আয়োজিত তিন দিনের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ দিন বিকেলে 'বিজ্ঞান মনস্ক' পশ্চিমবঙ্গকে আমন্ত্রণ করা হয় কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রদর্শনের জন্য। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক প্রায় দু'ঘন্টা ব্যাপী প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে ছিল ১) বিজ্ঞান ভিত্তিক কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান ও ২) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার। প্রথম পর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে ভন্ড সাধুবাবারা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে ঠকায়। বিভিন্ন প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞান মনস্কর কর্মীরা তা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। বর্তমান সমাজ কুসংস্কার টিঁকে থাকার বস্তুনিষ্ঠ কারণ কি তাও কর্মীরা ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় পর্বে বাজারের বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য নিয়ে কোন খাবারে কি ভেজাল থাকে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কর্মীরা উপস্থিত দর্শকদের কাছে প্রদর্শন করেন। ভেজাল কি? ভেজালকারীরা কেন খাদ্যে ভেজাল দেয়? এবং খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণ কিভাবে সম্ভব? মানুষের মনের এই সাধারণ প্রশ্নগুলির বস্তুনিষ্ঠ কারণ কর্মীরা ব্যাখ্যা করেন। সর্বশেষে সমস্ত মানুষদের কাছে বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠার আহ্বান রেখে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। ■

সংগঠন সংবাদ

বিজ্ঞান মনস্ক'র তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ঠাকুরপুকুর ৩এ বাস স্ট্যান্ডের নিকট ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম স্কুলে। বিগত দুবছরে বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠান ২ দিনের হলেও এই বছরে তা ১ দিনেই সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা / উদ্বোধন হয় সংগঠনের সম্পাদকের বক্তব্য রাখার মাধ্যমে। সম্পাদক তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এই বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় কেন কুসংস্কার টিঁকে আছে বা বর্তমানে ঘটে যাওয়া অন্যতম আলোড়িত ঘটনা দিল্লীর গণধর্ষণ বা ২০১২ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর গ্রামে ডাইনী অপবাদে পিটিয়ে মারার মতো ঘটনা কেন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার পাশাপাশি বলেন এই সকল সমস্যার সমাধান কখনই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্ভব নয়। আর এখানেই প্রয়োজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের। তাই বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হোক বা না হোক 'বিজ্ঞান মনস্ক' মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধি ঘটানোই বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনটির প্রধানতম লক্ষ্য আর এই উপলক্ষেই প্রতি বছরের ন্যায় বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে এই বছরও বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এর পরবর্তীতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের পাশেই একটি অংশে 'এসো আঁক' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রথমদিকে বেশ কম থাকায় এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে কিছুটা দেরী হয়। তবে এইবারের এই অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য হলো এটি কোনও প্রতিযোগিতা ছিলো না, বিজ্ঞান মনস্ক তার নীতিগত জায়গা থেকেই এই অনুষ্ঠানটিকে কোনও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করেনি। প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতাই মানব সভ্যতাকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণকারীর অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তৎক্ষণাৎ সৃষ্ট এক অনন্য শিল্পের নিদর্শনকে প্রত্যেকের গোচরে আনার তাগিদে প্রত্যেকটি আঁকাকে অনুষ্ঠান হলের বাইরে টাঙিয়ে রাখা হয় এবং সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন মানুষজন সবকটি সৃষ্টিকে বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেন।

এর পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিলো গল্প পাঠ। সত্যজিৎ রায়ের

অনুষ্ঠানমঞ্চে খুঁদে কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা

রচনা "অসমঞ্জবাবুর কুকুর" গল্পটি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণের সঞ্চার করে, গল্পপাঠের সময় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে গল্প শোনার আগ্রহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিলো বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপাত্র সমীক্ষণের পাঠকদের মতামত।

পাঠকদের মতামত

(১) বন্ধু সুমন বলেন – আমরা আমাদের চারিপাশে অনেক বিজ্ঞানের পত্রিকা দেখি। কিন্তু 'সমীক্ষণ' পত্রিকায় প্রতিটি লেখার মধ্যে থেকে আমরা বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠার যেমন প্রেরণা পাই তেমনি বিজ্ঞানের কিভাবে অপব্যবহার হচ্ছে সেটাও জানতে পারি। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – ডেঙ্গু খুব মারাত্মক ভাবে পরিবেশে ছড়িয়েছে। এই সুযোগে মশা মারার বিভিন্ন কয়েল-এর ব্যবসাও বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। রোগ ছড়িয়ে এই রকম ব্যবসার কথা 'সমীক্ষণ'-এ স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে, যেটা একটা খুবই দুঃসাহসিক কাজ।

শেষে আমি সকল পাঠকদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে

আপনারা যেমন 'সমীক্ষণ' পড়ছেন তেমনি আপনাদের কিছু মূল্যবান বক্তব্যও কিংবা কোনো ঘটনা 'সমীক্ষণ'-এর জন্য লিখতে পারেন যাতে সমীক্ষণ ত্রৈমাসিক থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রকাশ হয়।

(২) ঝাড়খন্ড যুক্তিবাদী সমিতির শ্রী শঙ্কর কর বলেন "বিজ্ঞানের পত্রিকা হিসাবে এটি ভীষণ উপযোগী একটি পত্রিকা। বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে (তা সামাজিকও হতে পারে) বিজ্ঞানের আলোকে তুলে ধরে এই পত্রিকা।"

এরপরের অনুষ্ঠান ছিলো "বিতর্কমূলক আলোচনা"। সাধারণত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কোনও প্রতিযোগীর দক্ষতার কারণে কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ অনৈতিক সিদ্ধান্তকেও প্রতিষ্ঠা করে দেয়, সেই কারণে এই বছর থেকে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিতর্কমূলক আলোচনার অনুষ্ঠান রাখা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন ও সকলের বক্তব্যের শেষে প্রত্যেকের সাথে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্যের বিশ্লেষণ চলে এবং পরিশেষে প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা বিজ্ঞান মনস্ক'র নীতির সাথে সহমত পোষণ করে। এবারে বিতর্কমূলক আলোচনার জন্য মোট তিনটি বিষয় ঠিক করা হয় – ১) কৃষি জমিতে শিল্প কতটা যুক্তিসঙ্গত? ২) সারোগেট মাদারহুড কতটা মানবিক? এবং ৩) সমাজে চরমতম অপরাধের নিদর্শনমূলক মৃত্যুদন্ড সমাজকে কতটা গঠন করে? প্রায় পনেরো জন বিভিন্ন বয়সের মানুষ এতে উৎসাহের সাথে অংশ নেয়।

এর পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিলো "ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন"। এই অনুষ্ঠানটিতে মোট ৩টে স্কুল অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে পল্লীশ্রী স্কুলের অংশগ্রহণকারীদের অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। এই স্কুলের শিক্ষকদের এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান ও তাদেরকে মডেল প্রস্তুতের জন্য সাহায্য করা ছিলো যথেষ্ট উদ্দীপনাময়। এছাড়া ব্রতচারী স্কুলের ছাত্রদের অংশগ্রহণ-এর পাশাপাশি উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। এই দুটি স্কুলে ছাড়াও আলিপুর মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুলের একজন ছাত্রী তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পল্লীশ্রী স্কুলের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে মডেল প্রদর্শিত হয় তার মধ্যে লাল পিঁপড়ের বাসস্থান, কাগজের মন্ড থেকে মুখোশ তৈরী বা অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু বানানোর প্রচেষ্টা ছিলো যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহপ্রদাণকারী। এছাড়া তাদের $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ ফর্মূলাটির হাতে কলমে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদর্শন ছিলো তাদের দক্ষতা। বিজ্ঞান সম্মতভাবে কোনও গাণিতিক ফর্মূলা শেখার এক অনন্য উদাহরণ। এইগুলি ছাড়াও পল্লীশ্রী স্কুলের ইলেকট্রিক সার্কিটের মাধ্যমে কোনও মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের সঠিক উত্তর প্রদানের সাথে সাথে আলো জ্বলে ওঠার প্রয়োগটি ছিলো যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে প্রদর্শনটি বিজ্ঞান মনস্ক'র বক্তব্যের সহমত পোষণ না করলেও তার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা যথেষ্ট ভাবে সাধুবাদ পাওয়ার অধিকারী ছিলো। শেষে ব্রতচারী স্কুলের পক্ষ থেকে পিরামিড প্রদর্শনও যথেষ্ট পরিশ্রম ও উৎসাহের সংমিশ্রণের সাক্ষ্য বহনকারী ছিলো।

এইসব অনুষ্ঠানগুলির মাঝে সুকুমার রায়ের জীবনীর উপরে সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা নির্দেশিত এক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনটি দর্শকরা বেশ উপভোগ করেন।

এরপরে মধ্যাহ্ন ভোজনের অনুষ্ঠান থাকলেও সময়মত মধ্যাহ্ন ভোজন তৈরী না হওয়ায় বিজ্ঞানের খেলা প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিতে সামান্য কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকলেও দর্শকদের মনোগ্রাহী হয়।

এরপরের অনুষ্ঠান ছিলো বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনগুলির আলোচনা এবং বিষয় ছিলো "বর্তমান প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের করণীয় কি"? এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনকে আহ্বান জানানো হলেও ৩টি বিজ্ঞান সংগঠন তাতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিজ্ঞান মনস্ক'ও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই বহু সংখ্যায় বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনগুলি বিজ্ঞান প্রসারের তাগিদে কাজ করে থাকে কিন্তু তবুও কুসংস্কার প্রসার ও ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেনি তাই এই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান সংগঠনগুলি কে কি চিন্তা ভাবনা করছে তা জানা বোঝার মাধ্যমে আগামী দিনের বিজ্ঞান আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিজ্ঞান মনস্ক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঝাড়খন্ড যুক্তিবাদী'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন তাদের কাজকর্ম করে থাকলেও বিদ্যমান মুনাফাখোরী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শুধুমাত্র অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের বিস্তারের পিছনে দায়ী। তাছাড়া বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শোষণের পিছনেও এই বিদ্যমান ব্যবস্থা দায়ী, তাই এইসবের থেকে মুক্তির জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করতে হবে ও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে।

এরপরে "সন্তোষপুর বিজ্ঞান সংগঠন" পক্ষ থেকে একজন বক্তব্য রাখেন। এই বক্তা বলেন যে তার ব্যক্তিগত জীবনে যা উন্নতি হয়েছে, তিনি যে চাকরী-বাকরী পেয়ে একটি ভদ্রস্থ জীবন যাপন করছেন তার পিছনে তার এই বিজ্ঞান সংগঠনে যোগদানের ভূমিকা সর্বাধিক।

এরপরে 'প্রগতিশীল যুক্তিবাদী বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে বর্তমান সময়ে কুসংস্কার ও অন্যান্য অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন আরও দৃঢ় করতে বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

এর পরবর্তীতে ছিল বিজ্ঞান মনস্ক'র সেমিনার। বিষয় ছিল "ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ এবং তার প্রতিকার"। সেমিনারের শুরুতেই বলা হয় যে ক্রটিকে আর্সেনিক দূষণ বল্লেও এটি দূষণ নয় কারণ দূষণ প্রধানত মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যা কিন্তু আর্সেনিকের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক তাই একে দূষণ বলা ঠিক নয়। বলা হয় বিজ্ঞান মনস্ক কখনই কাউকে জোর করে বিজ্ঞান শেখানোর চেষ্টা করে না কিন্তু বিষয়ের চাহিদার খাতিরে ও প্রসঙ্গক্রমে বিজ্ঞানের কিছু জটিল বিষয়ের উত্থাপন করতে হয়। এরপর আর্সেনিক কিভাবে মানুষের শরীরে তার বিষাক্ত প্রভাব ছড়িয়ে তা আলোচনায় উঠে আসে। আর্সেনিক কিভাবে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে ও বিঘ্ন ঘটায় তা আলোচনায় উঠে আসে। এরপরে আর্সেনিকের উৎসগুলি ও বিস্তারের ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিকে দেখান হয় এবং বলা হয় যে হিমালয়ই এদেশের আর্সেনিকের প্রধান উৎস। আলোচনায় পরবর্তী অংশে বলা হয় যে আর্সেনিক দূষণের জন্য মূলত যে চাষীদের দায়ী করা হয় (শ্যালো পাম্প দ্বারা চাষের জন্য) তা যথার্থ নয় কারণ আর্সেনিক সমস্যা প্রাকৃতিক। এছাড়া বলা হয় যে আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' নির্ধারিত আর্সেনিক সহনশীল মাত্রা ০.০১ মি.গ্রা/লিটার হলেও ভারতবর্ষে আর্সেনিক প্রভাবিত এলাকায় তার মধ্যে স্থির করা হবে ০.০৫ মিগ্রা/লিটার, যা 'হু'-এর নির্ধারিত মাত্রার ৫ গুণ। আলোচনায় সকলের জন্য বিনামূল্যে আর্সেনিক ও জীবাণুমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবী জানানো হয়। আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষদের নিখরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং মৃত মানুষদের ক্ষতিপূরণের দাবী জানানো হয়।

বার্ষিক অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ লগ্নে হয় শ্রুতিনাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। 'ফ্যাক্টর এক্স' নামক শ্রুতিনাটকটি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট হাসির সঞ্চার করে ও বেশ উপভোগ্য হয়। হাসিচ্ছলে এই নাটকটির মধ্যে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে কিভাবে মুনাফা করা হয় তার একটা সামান্য নিদর্শন রাখা হয়। কুশীলবরা দক্ষতার সাথে নাটকটি পরিবেশন করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের মান এইবারে সে রকম ভালো ছিল না। সুরের খামতির সাথে পরিবেশনও যথেষ্ট ভালো ছিলো না।

বিজ্ঞান মনস্ক'র এইবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের উপস্থিতি মোটের খুব খারাপ না থাকলেও সামগ্রিকভাবে প্রোগ্রামে শৃঙ্খলার অভাব ছিলো। ■

● *২৪ পৃষ্ঠার পর* ➔

ড: ডি. এন. গুহ মজুমদারের সাক্ষাৎকার

● বি. ম. ঃ আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা কী আছে?

ড: গুহ মজুমদার ঃ প্রতিটি ব্লক হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে বিনা পয়সায় ক্লিনিক খোলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। রোগীদের শরীরে লক্ষণ অনুসারে যে সমস্যাগুলি ডাক্তাররা চিহ্নিত করেন যেমন ব্রঙ্কাইটিস, লিভারের অসুখ, চামড়ার অসুখ, ... সেই হিসাবে তাদের চিকিৎসা করা হয়। শুধু চিকিৎসা করা বা ওষুধ খাওয়ালেই সমস্যার সমাধান হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্যান্য সাপোর্ট ছাড়া বাস্তবে কোনও চিকিৎসা সম্ভব নয়। সামগ্রিক ব্যবস্থা ঠিক না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

● বি. ম. ঃ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেবার জন্য। আমাদের বিশ্বাস সাক্ষাৎকারটি আর্সেনিক সমস্যা ও সমাধানের সঠিক পথ নিশ্চয়ই জনগণের সামনে তুলে ধরবে।

ড: গুহ মজুমদার ঃ না, না ঠিক আছে। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। ■

-ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ-

নভেম্বর ১

'পেন্ স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ডিউক ইউনিভার্সিটি'-এর বিজ্ঞানীরা এক ধরণের জিনের আবিষ্কার করেছেন যেটির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত স্নায়ু কোষের পুনরুৎপত্তি সম্ভব।(Science Daily) (Cell Rep)

চীন ঘোষণা করেছে যে তারা ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম ১০০ পেটাফ্লপ্ (Petaflop) সুপার কম্পিউটার তৈরী করবে। (Tech eye)

নভেম্বর ২

গ্লাইবেরা (Glybera) হচ্ছে প্রথম জিন চিকিৎসা (Gene therapy) যেটি পশ্চিমী দুনিয়ার নিয়ামক সংস্থা অনুমোদন করেছে। বাণিজ্যিকভাবে এটি ২০১৩ সালের শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করবে। (BBC) (Uniqure)

নভেম্বর ৫

১৫ বছরের গবেষণার সাহায্যে "Polycystic kidney disease" _ এই ব্যাধিকে নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। এটি জীবননাশক জেনেটিক ব্যাধির মধ্যে পড়ে এবং বিশ্বের ১২.৫ মিলিয়ন মানুষ এতে আক্রান্ত। এর আগে পর্যন্ত এই ব্যাধির উপসর্গগুলিকে শুধুমাত্র নিরাময় করা সম্ভব হত। (University of Zurich) (NEJM)

নভেম্বর ৬

ক্যান্সার কোষের মধ্যে একক রাসায়নিক পদার্থকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন প্রকৃতির ক্যান্সারের নিরাময় সম্ভব। এই পদ্ধতির দ্বারা নির্ভুলভাবে রশ্মিবিকিরণের দ্বারা চিকিৎসা (radiotherapy) সম্ভব। (BBC) (NCRI)

নভেম্বর ৭

কানাডার গবেষকরা বিশ্বের প্রথম এইচ আই ভি-র প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। "Phase-1" পরীক্ষায় এটি সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এটি বাজারে আসবে। (io9)

বিভিন্ন মনুষ্য-রোগগুলিকে খুব শীঘ্রই ইলেকট্রনীয় 'অরগ্যান-অন-আ-চীপ' (organ-on-a-Chip) -এ মডেল আকারে বানানো সম্ভব হবে। তা সম্ভব হলেই মনুষ্যশরীরের উপর গবেষণার প্রয়োজন হবে না। গবেষণা জগতের এক দিগন্ত খুলে যাবে। (সায়েন্স ডেইলী)

নভেম্বর ৮

* MIT -র বিজ্ঞানীরা এক ধরণের hearing aid -এর জন্য ব্যাটারী আবিষ্কার করেছেন। যা অন্তঃকর্ন হতে আয়ন ব্যবহার করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে।

নভেম্বর ১২

* "লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার" যন্ত্রে এক দুর্লভ কণার ক্ষয় ধরা পড়েছে। এবং এর জন্য "সুপারসিমেট্রি" (Super symmetry) থিওরির উপর সংশয় দেখা দিয়েছে। (New Scientist)

নভেম্বর ১৩

* দীর্ঘ আয়ু সংক্রান্ত একটি জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে যেটি "Hydra vulgaris" নামক জীবানুকে অবিনশ্বর করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এটি মানুষের জীবন কাল বৃদ্ধিতেও সক্ষম হতে পারে। (Uni Kicl)

নভেম্বর ১৪

* একদল আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক এমন একটি জিনের আবিষ্কার করেছেন যেটি শিপাঞ্জী হতে মানুষের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। মানুষের মস্তিষ্ক গঠনের ক্ষেত্রে miR-941 নামক জিনটি বিশেষ ভাবে সক্রিয় এবং মানুষ কিভাবে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ব্যবহার জানলো সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবে। (Science Daily) (Nat. Comm)

*Mayo Clinic -এর গবেষকরা এমন এক জিন আবিষ্কার করেছেন যেটি আলজাইমার ব্যাধিকে তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। গত ২০ বছরের ইতিহাসে এই জিনটি আলজাইমার ব্যাধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (Science Daily)

* আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস এণ্ড টেকনোলজি (এন আই এস টি)-এর গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে একক পর্দা বিশিষ্ট কার্বন ন্যানোটিই ডি এন এ মৌলগুলিকে জারণের হাত থেকে রক্ষা করে। (PhysOrg) (Small)

নভেম্বর ১৫

* বিজ্ঞানীদের দাবী সদ্য আবিষ্কৃত ন্যানোটেক সুতা এবং Paraffix Wax মিশ্রিত কৃত্রিম মাংসপেশী যা নিজের ওজনের তুলনায় ১,০০,০০০ গুণ বেশী ওজন তুলতে সক্ষম এবং তা সাধারণ মাংসপেশীর ৮৫ গুণ বেশী যান্ত্রিক শক্তি তৈরী করতে

সক্ষম। (Science Daily) (Science)

নভেম্বর ১৯

* গবেষণায় জানা গেছে ব্রিটেনের পক্ষীকূল ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২১০ মিলিয়ন পাখির দেখা মিলত ১৯৬৬ সালে; সেখানে এখন মেলে প্রায় ১৬৬ মিলিয়ন। (RSPB) (BBc) (Report)

* কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ইঞ্জেকসানের মাধ্যমে প্যারালাইসড্ কুকুরের দেহে নাসিকা রন্ধ্রের কোষ ব্যবহার করে দেখেছেন যে ২৩টি কুকুর তাদের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের দাবী মানুষের মধ্যেও এই নিরাময় সম্ভব। (Channels TV) (Daily Mail) (Brain)

IBM -এর গবেষকরা ৫৩০ বিলিয়ন নিউরোন (neuron) এবং ১০০ বিলিয়ন সাইন্যাপসর (Synapses) অনুকরণ করেছেন একটি সুপার কম্পিউটারে। (Kurzwei LAI) (GizMag) (sc12)

নভেম্বর ২০

* World Resources Institute - বলেছে ১,০০০ এর বেশী কয়লাচালিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে, যার অধিকাংশটাই হবে ভারত এবং চীনে। (The Guardian) (WRI)

* পদার্থ বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন "ডি এন এ ন্যানোটেক্নোলজি দিয়ে Synthetic membrane channel তৈরী করা সম্ভব। (Science Daily) (Science)

* বিজ্ঞানীরা কুকুরের নাকের মতন দেখতে এক কম্পিউটার চিপ্ আবিষ্কার করেছেন যেটির সাহায্যে দ্রুত অতি সামান্য পরিমান এমনকি এক বিলিয়ান ভাগের এক ভাগ ঘনত্বের বাষ্প কণাকে সনাক্ত করতে সক্ষম। (UCSB) (Anal. Chem.)

নভেম্বর ২৮

* 'নেচার' পত্রিকার সদ্য প্রকাশিততে বলা হয়েছে যে এক নতুন পদ্ধতিতে Seniconductor তৈরী করা সম্ভব। এই পদ্ধতি দ্রুততায় ও সস্তায় Seniconductor তৈরীতে পারদর্শী। (Science Daily) (Nature)

* বিজ্ঞানীরা পাঁউরুটির মধ্যে গমের Genetic Code বার করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে আরো উন্নতমানের ফসল তৈরী করা সম্ভব যা খরা, রোগপ্রতিরোধ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির দুর্যোগ থেকে ফসলকে রক্ষা করবে। (Science Daily) (Nature)

নভেম্বর ২৯

* বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং প্রকান্ড কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন, যার ভর সূর্য অপেক্ষা ১৭ বিলিয়ন গুণ বেশী। এই কৃষ্ণ গহ্বরটি একটি ছোট ছায়া পথে অবস্থিত। (BBC) (Universe Today) (Nature)

* নাসা ঘোষণা করেছে সে বুধগ্রহে বরফ জল এবং জৈব যৌগের সন্ধান পেয়েছে "MESSENGER" অনুসন্ধান যন্ত্র। (Reuters) (New York Times)

'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে এই শতাব্দীতে মানুষের জিনগত পরিবর্তন ক্রমশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির চাইতেও দ্রুত। (Wired) (Nature)

নভেম্বর ৩০

* ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যেটির মাধ্যমে সুরক্ষিতভাবে 'স্টেম সেল' গঠন করা সম্ভব। এর ফলে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের নিজস্ব স্টেম সেল গঠন করা সম্ভব হবে। (Seicnce Codex)

* Scanning electronmicroscope -এর দ্বারা ইতালিয় বিজ্ঞানীরা এই প্রথম DNA -এর ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই ছবিগুলির ডি এন এ-এর Double helix গঠন প্রমাণ করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে ডি এন এ-র অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাবলীও জানা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

ডিসেম্বর ২

গবেষকরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা এমন একটি জিনের উৎস সন্ধান পেয়েছেন যা মানুষকে চিন্তাশীল, যুক্তিশীল, ও জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণেও সাহায্য করে (সায়েন্স ডেইলী) (ন্যাট নিউরো সায়েন্সে)

ডিসেম্বর ৩

* নাসা ঘোষণা করেছে মঙ্গলগ্রহে 'Curiosity' অনুসন্ধান যন্ত্রটি এই প্রথম ভূ-বিশ্লেষণ করেছে এবং জলের কণা, সালফার এবং ক্লোরিনের সন্ধান পেয়েছে। (Slash Gear)

ডিসেম্বর ৪

* ব্রিটিনের এক শক্তি উৎপাদন সংস্থা ঘোষণা করেছে যে তারা আফ্রিকার ঘানা অঞ্চলে বৃহত্তম সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলবে। (BBC)

* নাসা ঘোষণা করেছে যে তারা Curiosity অনুসন্ধান যন্ত্রের সাফল্যের সাথে সাথে ২০২০ সালের মধ্যে আবার মঙ্গলগ্রহে অনুসন্ধান যন্ত্র পাঠাবে। (Space.com) (CNET)

ডিসেম্বর ৫

* 'United states' -এ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এই প্রথম Alzheimer's ব্যাধিতে আক্রান্তর মস্তিষ্কের ভিতরে Pace-

maker-এর মতন একটি যন্ত্র বসালেন। এই যন্ত্রটি মস্তিষ্কের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। যন্ত্রটি আগে Parkinson's disease - এ আক্রান্তদের শরীরে বসানো হয়েছে যার দ্বারা আক্রান্তের স্মৃতিশক্তির উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। (Science Daily)

ডিসেম্বর ৬

* "Golden Spike Company" ঘোষণা করেছে যে তারা ২০২০ সালের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে চন্দ্র ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে যার জন্য আনুমানিক মাথাপিছু ৭৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। (io9)

* বিজ্ঞানীরা Toxoplasma gondii নামক একটি এক কোষী পরজীবী (Parasite)-র, সন্ধান পেয়েছেন। যেটি মানুষের অন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে এবং এটি চিন্তাশক্তিতে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে এমনকি আত্মহত্যা করার প্রবণতা তৈরী করতে পারে। (The Independent)

ডিসেম্বর ৭

* ইউরোপে এই প্রথম একজন ব্রিটিশ তরুণীর দেহে অস্থি প্রতিস্থাপন চিকিৎসা করা হল। তরুণীর পা থেকে অস্থি নিয়ে সেই হাড় তার মেরুদন্ডে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কোন জেনেটিক সমস্যার দরুণ মেয়েটির মেরুদন্ডে এই অস্থিটি অগঠিত ছিল। (বি বি সি)

ডিসেম্বর ১৬

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীকে, জিনগতভাবে পরিবর্তিত এক ধরণের ভাইরাস ব্যবহার করে হৃৎপিন্ডের স্পন্দন সৃষ্টিকারী কোষে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন যা কার্যত জৈবিক পেসমেকার (বায়োলজিক্যাল পেসমেকার)। ভবিষ্যতে যা মানুষের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে কোন শল্য চিকিৎসা ছাড়াই।

(বিবিসি) (ন্যাট বায়োটেকনোলজি)

ডিসেম্বর ১৭

"University of Pittsburgh" -এর গবেষকরা এক ধরণের রোবোটিক বাহু আবিষ্কার করেছেন যেটি প্যারালাইসড্ রোগীদের সাহায্য করবে। (Gizmodo)

ডিসেম্বর ১৯

* চীনা বিজ্ঞানীরা অবলুপ্ত হাতি Palaeoloxo don –এর জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন এবং গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন যে এটি ১,০০০ খৃষ্ট পূর্বের। আগে মনে করা হত ৮,০০০ খৃষ্টপূর্বের এই হাতির বর্গটি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। (বি বি সি)

ডিসেম্বর ২১

*ইঁদুরের শরীরে "Trojan horse" চিকিৎসার শ্বেতকণিকার মধ্যে ভাইরাসকে কাজে লাগিয়ে Prostate cancer ব্যাধিকে নিরাময় সম্ভব হয়েছে। মানুষের উপর এই পদ্ধতি এখনও প্রয়োগ করা হয়নি। (বি বি সি)

ডিসেম্বর ২৬

"Wildlife Conservation Society" -র দাবী বাঘের সংখ্যা এখন আগের থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (WCS)

জানুয়ারী ২

* জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা একটি বিশালাকৃত উষ্ণপ্রস্রবণ এর সন্ধান পেয়েছেন যা তড়িতায়িত কণা দ্বারা গঠিত। এটি Milky way Galaxy-র মর্মস্থল থেকে জন্ম নিয়েছে। এটি ৫০,০০০ আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে করা হচ্ছে তারামন্ডলের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস এটাই। (Science Daily) (Nature)

জানুয়ারী ৪

* ব্রিটেনে এই প্রথম সফল ভাবে হস্ত প্রতিস্থাপন চিকিৎসা করা হল। (The Guardian)

জানুয়ারী ৬

* আলোক-সংবেদন কোষের সাহায্যে ব্রিটেনের গবেষকরা ইঁদুরের দৃষ্টিশক্তিহীনতা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি মানুষের দেহে Retinitis pigmentosa ব্যাধি নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। (BBC) (PNAS)

জানুয়ারী ৯

গামা সিক্রেটেজ নামক উৎসেচকের একটি প্রতিরোধক (inhibitor) যা পূর্বে আলজেইমার রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে তা অন্তকর্ণের লোমকূপ পুনরুৎপাদনে সক্ষম। বধিরতা দূরীকরণের চিকিৎসায় এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। (Scientific American) (Neuson)

জানুয়ারী ১১

* বিজ্ঞানীরা Breathalyzer যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ফুসফুস সংক্রমণ চিহ্নিত করতে পারবেন। (Scientific American blog)

জানুয়ারী ১৩

Massachusetts -এর চিকিৎসকরা ট্যাবলেটের মতন দেখতে মেডিক্যাল স্ক্যানার আবিষ্কার করেছেন যা সহজেই

গলাধঃকরণ করা যায়। এটির সাহায্যে দ্রুত খাদ্যনালীর রোগ নির্ণয় সম্ভব। (বি বি সি)

জানুয়ারী ২৩

বিজ্ঞানীরা এইচ ফাইভ এন ১ (H5N1) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার উপর আবার নতুন করে গবেষণা শুরু করেছেন। আগে এটি জীবাণু যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় বন্ধ রাখা হয়েছিল।

জানুয়ারী ২৮

বলিভিয়ার বিজ্ঞানীরা স্ট্রোক আক্রান্ত ইঁদুরের মস্তিষ্কে স্টেম সেল প্রয়োগ করে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পুনরায় চালু করেছেন। এই পদ্ধতি দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কের চিকিৎসা সম্ভব।

ফেব্রুয়ারী ১

এক ডাক্তারী গবেষণায় জানা গেছে, জৈব তাড়িতিক (বায়ো ইলেকট্রিক্যাল) সিগন্যাল – পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকরীভাবে দেহে ক্যানসারের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করা যায়। এমনকি কোষের তড়িৎ আধান মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে ক্যানসার প্রতিরোধও সম্ভব। (বি বি সি)

ফেব্রুয়ারী ২

ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা ইঁদুরের শরীরের জিনে-পরিবর্তন (GM) পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে রক্তকোষের বুড়িয়ে যাওয়া (ageing)-কে অনেকাংশে রোধ করতে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। (ডেইলী ক্যালিফোর্ণিয়ান)

ফেব্রুয়ারী ৪

– আমেরিকার এক গবেষক দল নতুন আনবিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে রক্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে অণু চলাচল সংক্রান্ত বাধা (Blood-Brain Barrier, BBB) অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদ্ধতি আগামী দিনে পারকিন্‌সন্‌স্ রোগের ন্যায় অন্যান্য স্নায়ুঘটিত রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী হতে পারে। (medicalexpress.com)

– একিনয়ডিয়া পর্বের কাঁটা যুক্ত একপ্রকার ছোট গোলাকার প্রাণী (Sea Urchins) এর এক উল্লেখযোগ্য ধর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে কোষ দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিবর্তিত করতে পারে। আগামী দিনে এটা শিল্পে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে মুক্ত করতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। (জিগম্যাগ)

ফেব্রুয়ারী ৬

– জ্যোতির্বিদরা জানিয়েছেন এই মহাবিশ্বের মোট বামন নক্ষত্রর ছয় শতাংশে পৃথিবীর ন্যায় গ্রহ থাকতে পারে। যাদের অস্তিত্ব পৃথিবী হতে মাত্র ১৩ আলোকবর্ষ। (ইউ এস এ টুডে)

– বিজ্ঞানীরা কুমেরু অঞ্চলে বরফের নীচে হ্রদ নামক জলাধারে ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন। (নিউইয়র্ক টাইমস্)

ফেব্রুয়ারী ১৪

– লার্জ হেড্রন কোলাইডার (এল এইচ সি)-কে দুবছরের জন্য বন্ধ রাখা হল। ২০১৪-এ পুনরায় চালু করার আগে তার বেশ কিছু যন্ত্রাংশে আধুনিকীকরণ ঘটানো হবে। ফলে বর্তমানে তা যে শক্তিতে চালিত হয় তার দ্বিগুণ শক্তিতে চালিত হবে (১৪ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট) (বি বি সি)

ফেব্রুয়ারী ১৫

– রাশিয়ার, চেলিয়াবিন্‌স্ক অঞ্চলে একটি ১০ টন ওজনের উল্কাপিন্ড পতনে শক্তিশালী কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং সহস্রাধিক আহত হয়। (বি বি সি)

ফেব্রুয়ারী ২১

– ক্যারিবিয়ান সাগরে ৫০০০ মিটার গভীরতায় একটি জ্বালামুখ নিঃসৃত জল প্রবাহের (hydrothermal vent) সন্ধান পাওয়া গেছে। এটিই এখনও পর্যন্ত সমুদ্রের নীচের গভীরতম জ্বালামুখ। (বি বি সি)

ফেব্রুয়ারী ২৪

– অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অক্সিজেন ব্যাতিরেকে কিছু কিছু মস্তিষ্ক কোষের সজীব থাকার কলা কৌশল আবিষ্কার করেছেন। ভবিষ্যতে এটি 'স্ট্রোক'-এর চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা নেবে। (বি বি সি)

– বিজ্ঞানীরা ভারত মহাসাগরের নীচে 'রোডিনিয়া' নামক এক প্রাচীন 'লুপ্ত' অতি মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। (বি বি সি)

ফেব্রুয়ারী ২৬

– গবেষণায় জানা গেছে নিদ্রাহীনতা জিনের ধর্মকে পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে মধুমেহ, স্থূলতা এবং হৃদরোগ সৃষ্টি করে।

ফেব্রুয়ারী ২৮

– ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দুইটি ইঁদুরের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলেকট্রনীয় যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যার ফলে দুইটি মস্তিষ্কের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করা সম্ভব হয়েছে। (ব্লুমবার্গ)

মার্চ ৩

– আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এক শিশুর দেহে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগ প্রয়োগ করে শিশুটির এইচ আই ভি নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন। ড্রাগটি প্রয়োগ করার

এক বছর পর পর্যন্ত কোন ওষুধ ব্যবহার না করেও এইচ আই ভি-র কোন উপসর্গ পাওয়া যায়নি। (দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট)

মার্চ ৬

– চীন ও ইজরায়েলের বিজ্ঞানীরা নিশ্বাস বায়ু পরীক্ষার মাধ্যমে পাকস্থলীর ক্যানসার নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এন্ডোস্কোপি ছাড়াই এই নির্ণয় সম্ভব। (মেডিক্যাল নিউজ টুডে)

মার্চ ১২

– মঙ্গলগ্রহে 'নাসা' প্রেরিত কিউরিওসিটি রোভার, মঙ্গলগ্রহের গেল ক্রেটারের পাথর পরীক্ষা করে তাতে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরোমিথেন ও ডাই-ক্লোরোমিথেন-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, যা স্মেকটাইট মৃত্তিকা (একপ্রকার খনিজ পদার্থ)-র অস্তিত্বও প্রমাণ করে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস্)

মার্চ ১৭

– বিভিন্ন তথ্য হতে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ-এ বিপুল বৈচিত্র্যের ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব জানা গেছে। অন্য একটি গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রকূলের ২৬০০ মিটার দূরবর্তী এবং সমুদ্র তলের ৫৮০ মিটার গভীরে পাথরের মধ্যে এই ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেছে। (লাইভ সায়েন্স) ■

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক

আপনার সম্পাদিত নভেম্বর '১২ সংখ্যাটিতে "প্রচার মাধ্যম ও সমাজ দায়বদ্ধতা" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সম্পর্কে 'সমকালিক' সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, "সমকালিক" একটি সদ্যোজাত সংস্থা এবং উক্ত আলোচনা সভাটি এই সংস্থার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা (প্রথমটি ছিলো "আজকের সময়" – বক্তা ড: অশোক মিত্র মহাশয়।)

সম্প্রতি, অনুষ্ঠিত আলোচনাসভাটির উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রচার মাধ্যমের (মূলতঃ সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) ভূমিকা এবং এই মাধ্যমগুলির কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমাজ দায়বদ্ধতা। উপস্থিত তিনজন বিশিষ্ট (সর্বশ্রী স্বান্তন চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ সাহা, অঞ্জন বেরা) বক্তা এই বিষয় তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সংবাদ মাধ্যমগুলির ক্রমপরিবর্তিত চরিত্র, তাদের শ্রেণী চেতনা এবং জন মানসের উপর এর প্রভাব ইত্যাদি উঠে আসে। প্রত্যেক বক্তাই প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন। ফলতঃ যে আলোচনার বিষয়বস্তু বাস্তব ও বস্তুতন্ত্রের আধারে নির্দেশিত সেই আলোচনায় "জোরাল বিজ্ঞানসম্মত কোন পথ" দেখাবার দায় অথবা অবকাশ ছিল না। পরন্তু সে দায় ছিল ভিড় ঠাসা উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর – কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানর তাগিদে।

টুকরো কিছু আলোচিত অংশ উল্লেখ করে প্রতিবেদক কোন্ সূত্রে এই সুখশ্রাব্য এবং উপভোগ্য আলোচনাটিকে সভার মূল সুরের প্রতিস্পর্ধী বললেন, তা শুধু সম্ভবতঃ তাঁরই ব্যক্তিগতভাবে বোধগম্য।

মূলকথা, বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিতে কোন কিছু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি কেউ যে কোন প্রেক্ষিতকে "ল্যাবরেটরী" বানিয়ে ফেলে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বিজ্ঞান ও তার প্রচারের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা বিপজ্জনক এবং আশু পরিত্যাজ্য।

শ্রী পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকের জবাব

মাননীয় পার্থসারথী বাবু,

সমীক্ষণের নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায় "প্রচার মাধ্যম ও সমাজ দায়বদ্ধতা কোন পথ দেখাতে পারল না" শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে আপনি যে সমালোচনাটি পাঠিয়েছেন, গুরুত্ব অনুভব করে আমরা তা প্রকাশ করলাম। চিঠিতে আপনি সমীক্ষণের ভূমিকাকে 'বিপজ্জনক এবং আশু পরিত্যাজ্য' বলে মন্তব্য করেছেন কারণ তা নাকি "যে কোন প্রেক্ষিতকে 'ল্যাবরেটরী' বানিয়ে ফেলে"।

প্রথমত আপনার কাছে প্রশ্ন থাকে "প্রচার মাধ্যম ও সমাজদায়বদ্ধতা" শীর্ষক সেমিনারে অংশ নিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক সহ অংশগ্রহণকারীদের করণীয় কি ছিল? আপনার মতে যেহেতু "তিনজন বিশিষ্ট বক্তা এই বিষয় তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন" তাই গুণমুগ্ধ হয়ে তা শুনে জল খেয়ে শুয়ে পড়া উচিৎ ছিল? নাকি এই 'সুচিন্তিত' বক্তব্যটিকে সমাজবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করা! অথচ চিঠিতে আপনি লিখেছেন "ফলতঃ যে আলোচনায় জোরালো কোন পথ দেখাবার দায় অথবা অবকাশ ছিল না। পরন্তু সে দায় ছিল ভিড় ঠাসা উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর – কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাগিদে।" এই বক্তব্য পরস্পর বিরোধী নয় কী? আপনি বলেছেন বক্তারা যেহেতু বিশিষ্ট তাই জোরালো

তৃতীয় বর্ষ ■ সংখ্যা ১-২ ■ জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৩ Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

বিজ্ঞানসম্মত কোন পথ দেখানোর দায় তাদের ছিল না, বাস্তবকে তুলে ধরাই যথেষ্ট। আর পথ দেখাবার দায় শ্রোতৃমন্ডলীর? এই বক্তব্য কোন 'শ্রেণীচেতনা'-র প্রকাশ?

এই বক্তব্য পেশের মাধ্যমে আপনি কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছেন? প্রতিদিন নানা বাণিজ্যিক টিভি চ্যানেল বা রেডিওতে তর্ক বিতর্ক করে শেষে সঞ্চালক শ্রোতা বা দর্শকদের উপর যেমন দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দেয় সেইরকম?

আমরা কোন আলোচনা বা সেমিনারে অংশ নিয়ে থাকি সেখানে কোন বিশিষ্টজন অংশ নেবেন নাকি অখ্যাতরা এই বিচারে নয়। আলোচনা কি হচ্ছে, কোন প্রেক্ষিতে তা পেশ করা হচ্ছে, কোন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে তা পেশ করা হচ্ছে এবং তার মধ্যে শিক্ষণীয় কী এটা আমাদের বিচার্য বিষয়। যে কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সরকারী ও কোন বেসরকারী বাণিজ্যিক মিডিয়া সম্পত্তিবান শ্রেণীর দর্শন দ্বারাই পরিচালিত হয় এটা যে কোন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রেরই জানা আছে। অথচ উক্ত আলোচনায় বক্তা পঙ্কজ সাহা বলেছেন যে এদেশে প্রাইভেট টিভিগুলি বিজ্ঞাপণ সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তাদের কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। আর ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) সরকারী হওয়ায় এবং অর্থের জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থার মুখাপেক্ষী না হওয়ায় সে শ্রেষ্ঠ এবং তা 'শুধু জাতির কণ্ঠস্বর নয় বিবেকের কণ্ঠস্বর'। এই বক্তব্যকে আপনি এখনও বাস্তব ও বস্তুতন্ত্রের আধারিত বলে মনে করেন? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীরাষ্ট্রের মুখপাত্রকে শ্রেণীনিরপেক্ষ সাজানোর মত ঘৃণ্য প্রয়াসকে 'বিপজ্জনক এবং আশু পরিত্যাজ্য' বলাটাই উচিৎ নয় কি?

উক্ত বিশিষ্ট বক্তা আলোচনায় সেদিন বলেছিলেন "আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল বড় বেশি। এখানে একটা সত্যিকারের সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠতে দেওয়া উচিৎ। কারণ রাজনৈতিক দলগুলিরও দুঃসময় আসবে। তখন এরাই মুক্ত কণ্ঠে বলবে।" এই বক্তব্য কোন বস্তুতন্ত্র আধারিত? সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় এটা হল বুর্জোয়া মতাদর্শ। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ব্যবস্থার সেবক বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। ক্ষয়িষ্ণু এই ব্যবস্থা বারে বারে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে যখন সংকটে পড়ে তখন ওই দলগুলিও সংকটে পড়ে। তখন জনতার মুখোশ পড়ে সিভিল সোসাইটিগুলি পথে নেমে জনতাকে বিভ্রান্ত করে ব্যবস্থাকে রক্ষা করে। কোন বস্তুতন্ত্রী অথবা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের এটা অজানা থাকার কথা নয়।

উক্ত আলোচনার বিভিন্ন অংশগুলিকে নিয়ে এরকম বহু চর্চা করা যায়। নভেম্বর ২০১২'র সমীক্ষণ প্রকাশিত রিপোর্টে আমরা তা করিনি কারণ তা আপামর জনতার কোন কাজে আসবে বলে আমরা মনে করিনি। তবে সেমিনারের বক্তাদের আলোচনায় জোরালো বিজ্ঞানসম্মত কোন পথ দেখাবার দায় অথবা অবকাশ ছিল না বলে সমকালিক সংস্থার পক্ষ থেকে চিঠি লিখে আপনি ভালই করেছেন। 'আর্ট ফর আর্ট', 'কালচার ফর কালচার', 'সেমিনার ফর সেমিনার' জাতীয় পুরানো রেকর্ড আবার বাজতে শুনলাম। আলোচক অথবা পারফর্মারদের কোন দায় নেই পথ দেখাবার, এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে সমীক্ষণের নভেম্বর ২০১২ সংখ্যার পাতায় আপনাদের সেমিনার প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ভুল কিছু বলা হয় নি।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি আপনার সমীক্ষণ পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যাটি আবিষ্কার করলাম সোনারপুর রেলষ্টেশনের একটি বইয়ের স্টলে। সংখ্যাটির বিশেষ নিবন্ধ 'ডেঙ্গু কী এবং কেন?' এবং এই বিষয়ে অধ্যাপক বিভূতি সাহা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি পড়ে বহু কিছু জানলাম, শিখলাম। সম্পাদকীয়টিও সুচিন্তিত এবং সুলিখিত।

আপনাদের এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

ড: ননী ভূষণ ফৌজদার
সোনারপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা)

সম্পাদকের উত্তর ঃ ড: ননীভূষণ ফৌজদার মহাশয়কে তাঁর চিঠির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনি যোগাযোগ করলে পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যাগুলিও সংগ্রহ করতে পারেন। আপনার মতো সচেতন পাঠকের মতামত পেলে 'সমীক্ষণ' আরও সমৃদ্ধ হবে, আমরাও অনুপ্রাণিত হব। আপনার পত্রের জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই।

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com